মহাপ্রাচীর

স্বদেশের সাথে প্রবাসের অনন্য সেতু বন্ধন

জুলাই-ডিসেম্বর'২৩ | ১০ম সংখ্যা

চীনা বিশ্ববিদ্যালয় :
শিক্ষা, গবেষণা, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির সম্মিলনস্থল

বাংলাদেশ-চীন ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা

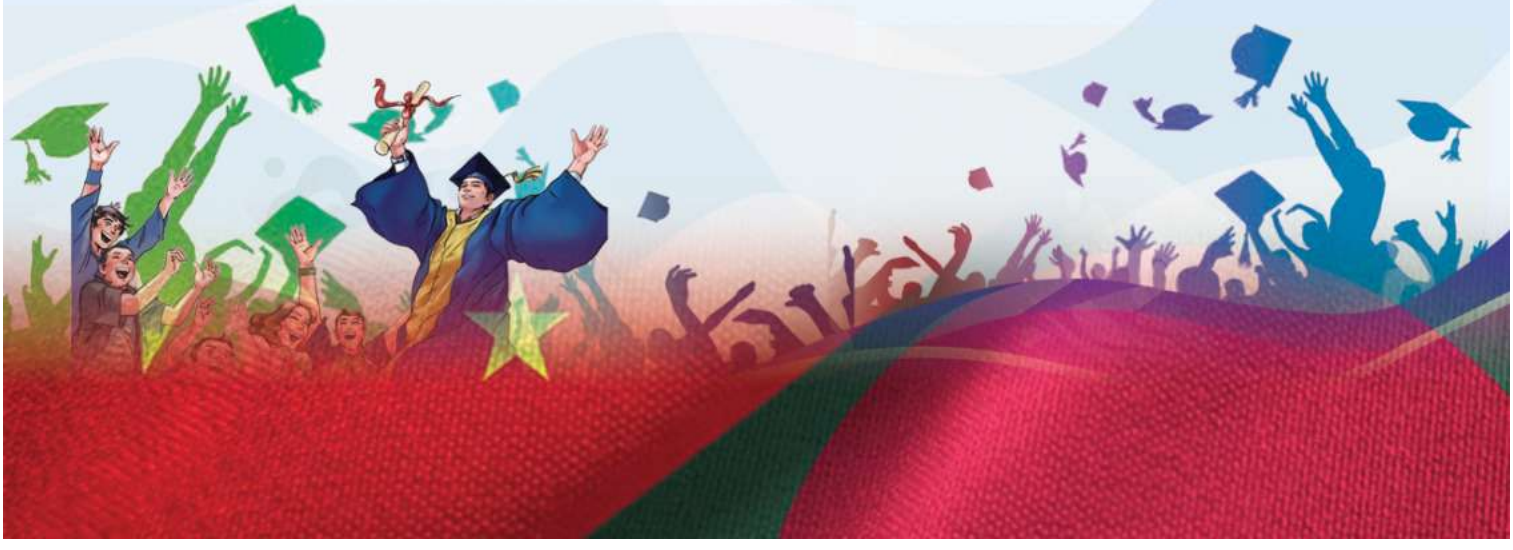

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক : এ বি সিদ্দিক

নির্বাহী সম্পাদক : জান্নাতুল আরিফ

সহযোগী সম্পাদক : এন্ড্রু দাস শুভ্র

সম্পাদনা সহকারী : ডাঃ কে এম সুস্মি
ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান শিহাব
রাওহা বিন মেজবা

তত্ত্বাবধানে : অধ্যাপক ড. মো. সাহাবুল হক
ড. এ. এ. এম. মুজাহিদ
মোহাম্মদ তৌহিদ
ড. মোঃ বশির উদ্দীন খান
মারুফ হাসান
ড. এস. এম. মিনহাজ
আসগর আহমেদ
ফারহানা নাজনিন শুচি
কাওসার আহমেদ

সূচিপত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দিন	৪
পিএইচডি রিসার্চ : নতুন এক শিক্ষা পাসপোর্ট	৭
এক ঝলকে দক্ষিণের কেন্দ্রীয় ক্যাম্পাস! সেন্ট্রাল সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, চীন	৯
চীনে পিএইচডি কেন করবেন?	১৬
নর্থ চায়না ইলেকট্রিক পাওয়ার ইউনিভার্সিটি : এনার্জি এডুকেশন এবং ইনোভেশনে একটি উজ্জ্বল নাম	২০
Memories of Friendship and Learning	২২
China in My Eyes	২৪
চীনে ভ্রমণ : এক স্বপ্নের সাক্ষাৎ	২৬
প্রচেষ্টা ও প্রাপ্তি : আত্মকথা	২৮
দ্বিভাষিক মুহূর্ত : বাংলা ও চীনায় প্রথম দিন	৩২
China's AI Ascent: Navigating the Global Frontier	৩৩
চীনে শিক্ষা, গবেষণা, এবং প্রযুক্তির অগ্রগতি	৩৬
কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং এআই : প্রযুক্তির ভবিষ্যত	৩৮
CHINESE EDUCATION	৪২
Navigating the Paradox: Exploring the Dual Experience of Celebrity Phenomenology in the Public and Private Selves	৪৪
ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শামসুল হকের সাক্ষাৎকার	৪৬

মেঘে ঢাকা মহাপ্রাচীর	৫০
Sports Day	৬৮
প্রবাসে বিজয়, বায়ান্ন	৬৯
জন্ম নেয়াটাই বুঝি আজন্ম পাপ!	৭১
মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের ভূমিকা (১)	৭৩
মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের ভূমিকা(২)	৭৫
মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের ভূমিকা (৩)	৭৮
ভাবনা	৭৯
না পাওয়া	৮০
পতাকা	৮১
মায়াবী কাশফুল	৮২
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন	৮৩

সম্পাদকের কথা

চীনে অবস্থানরত বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী ও পেশাজীবীদের প্লাটফর্ম হিসেবে ২০১৬ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকেই বাংলাদেশ ও চীনের আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিওয়াইএসএ) নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতা ও দুই দেশের আন্তঃমিথস্ক্রিয়া জারি রাখতে ২০১৯ সালে এর সাথে যুক্ত হয় অনলাইন ম্যাগাজিন, 'মহাপ্রাচীর' এবং অনলাইন ভিত্তিক সংবাদ পোর্টাল, 'বিসিওয়াইএসএ নিউজ'। বিদগ্ধ পাঠকসমাজ এই উদ্যোগগুলোকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে আমাদের ঋণী করেছেন।

হাঁটি হাঁটি পা পা করে ৫২তম মহান বিজয় দিবসের কিছুদিন পরেই আজ আমরা আমাদের ম্যাগাজিনের ১০ম সংখ্যা প্রকাশের দ্বারপ্রান্তে। 'মহাপ্রাচীর' এর এই সংখ্যাটিকে আমরা বিশেষভাবে সাজিয়েছি। বর্তমানে পুরো পৃথিবীতে চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞান-গরীমা-শৌর্য্য-বীর্যে শীর্ষে স্থান করে নিয়েছে। তাই, এবারের সংখ্যার মূল প্রতিবাদ্য ছিল চীনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলো। শিক্ষার পরিবেশ, গবেষণার অগ্রগতি, প্রযুক্তির ছোঁয়া, সর্বোপরি নিজেদের সংস্কৃতি চর্চার এক সম্মিলনস্থল হিসেবে জাতি বিনির্মাণে চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কীভাবে ভূমিকা পালন করছে, তা নিয়ে থাকছে বিশদ আলোচনা। এর পাশাপাশি থাকছে গল্প ও কবিতার সমাহার। পাঠকমনকে ভিন্ন স্বাদ দিতে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'প্রবাসে বিজয়' ২০২৩ এর নির্বাচিত পেইন্টিংও রয়েছে এবারের সংখ্যায়। সম্মানিত লেখকগণ লিখেছেন; আমাদের বিশ্বাস—পাঠকগণ ঋদ্ধ হবেন।

একটি ম্যাগাজিনের সুন্দর কারুকার্যময় আবেদনের পেছনে অনেক গল্প লুকিয়ে থাকে। লেখা সংগ্রহ, বাছাই, ডিজাইন নির্বাচন, সম্পাদনাসহ প্রতিটি ধাপ সম্পন্ন করা অত্যন্ত কঠিন ও সময়সাপেক্ষ বটে। ম্যাগাজিনের সাথে সম্পৃক্ত এক ঝাঁক মেধাবী তরুণ এই সুকঠিন কাজগুলো করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে ম্যাগাজিনকে প্রতিনিয়ত এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন। ম্যাগাজিন প্রকাশের মতো এই সুকঠিন কাজটি সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিসিওয়াইএসএর সম্মানিত উপদেষ্টামণ্ডলী, পরিচালনা পর্ষদ, সম্পাদনা পর্ষদ এবং লেখকদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মানুষ হিসেবে আমরা কেউই ভুলের উর্ধ্বে নই। তাই, আমাদের অগোচরে হওয়া ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ।

সবশেষে, সবার জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও সফলতা কামনা করি। বাংলাদেশ-চীনের সম্পর্ক চিরজীবী হোক।

বিনীত,
এ বি সিদ্দিক
সম্পাদক, মহাপ্রাচীর।
সভাপতি, বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিওয়াইএসএ)।

২০ জানুয়ারি, ২০২৪
নানজিং বিশ্ববিদ্যালয়, নানজিং, চীন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দিন

বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের জীবনের সবচেয়ে ভালো আর সবচেয়ে বেদনাদায়ক কিছু মুহূর্তের সাক্ষী। যে মুহূর্তগুলো আবার আমাদের পথচলার একমাত্র খোরাক ও বটে। কারণ, নিজেকে নতুন করে খোজার ইচ্ছা, নতুন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার যে অনুপেরনা, সেটা তো বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রথম দিন থেকেই শুরু হয়, আর এই সুদীর্ঘ পথ চলায় ঘটে নানান ঘটনা। আর, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই প্রথম দিন আমাদের স্মৃতির পাতায় খুব যত্ন করেই লেখা থাকে।

মহান রাব্বুল আলামিনের রহমতে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ হয়েছে, বাংলাদেশের গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ তথা গণ-বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা; নাঞ্চাং বিশ্ববিদ্যালয়, নাঞ্চাং শহর, জিয়াংসু প্রভিন্স, চীন; চীলু কলেজ অফ মেডিকেল তথা শান্ডং বিশ্ববিদ্যালয়, জিনান শহর, শান্ডং প্রভিন্স, ক্যাপিটাল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বেইজিং শহর, চীন। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিটি ক্যাম্পাসের প্রথম দিনগুলো আজও মনে পড়ে। দেশের বাহিরের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের প্রথম দিন একটু ভিন্ন ছিল আমার জন্য।

সেই দিনটি ছিল ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়, আমি প্রথম ক্লাসে উপস্থিত হতে যথারিতি সময় হাতে নিয়ে ছাত্রাবাস থেকে বের হলাম, আমাদের নাঞ্চাং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস গুলো হতো মেইন ক্যাম্পাসে, যেটি কয়েক মাইল দূরে আমার ছাত্রাবাস থেকে, তাই একটি পাবলিক সাইকেল ভাড়া করে নিলাম, যেটি প্রতি ৩০ মিনিটের ব্যাবধানে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। যাইহোক, ক্লাস টাইমের অনেক আগেই যে ভবনে

ক্লাস হবে সেটা খুজে পেলাম বটে, কিন্তু ভবন অনেক বড় হওয়ায় ক্লাস রুম খুজে পেতে একটু সময় লেগে গেল, কারণ, রুম গুলো জোড়, বিজোড় আলাদা করে সাজানো ছিল যেটা আগে বুঝতে পারি নাই। একটু বেশি সময় লাগলেও ক্লাস শুরুই অনেক আগেই রুমে পোছাতে পারি, আর রুমে ঢুকতেও অবাক হয়ে যাই, রুমে সাজানো গোছানো, পরিপাটি অবস্থা দেখে না! যে কারনে অবাক হই তা হল, হটাৎ একজন মধ্য বয়স্ক মানুষ সম্বোধন করলেন, এবং যেকোন একটি ছিটে বসতে অনুরোধ করলেন। যাইহোক, আমি ধরে নিয়েছিলাম তিনি শিক্ষক এর সহোযোগী বা অন্য কেউ। আমি বসে পড়লাম, আর বসে বাকি অন্য দেশের ছাত্রদের সাথে পরিচয় হতে থাকলাম, কথা হল: উজবেকিস্থান, কাজাকিস্তান, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, রাশিয়া, ইয়েমেন, মরক্কো এর কিছু শিক্ষার্থীদের সাথে।

প্রায় কিছুক্ষণ পর, হঠাৎ এক ভিন্ন ধরণের সুমধুর গানের সুর শুনতে পেলাম আমরা সবাই, সবাই একে অন্য কে বলছি, এই গানের আওয়াজ কেন!! কয়েক সেকেন্ডে পর আওয়াজ টি বন্ধ হয়ে গেল, আর সেই মধ্য বয়স্ক মানুষটি দাড়িয়ে সকলকে আবার সম্বোধন করে বললেন, এখন আমাদের ক্লাস শুরু হবে, আর তার পরিচয় শুনে বুঝতে পারলাম তিনিই আমাদের শিক্ষক, যিনি কিনা ক্লাস শুরুর অনেক আগেই ক্লাসে এসে সব শিক্ষার্থীদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তার পাঠদানের ভংগিমা, সবাইকে ক্লাসে বিষয় বস্তু বুঝানো ও মনোযোগী করে তোলা ও মনোযোগ ধরে রাখার যে প্রক্রিয়া, তা আমাকে খুবই মুগ্ধ করে। বলা বাহুল্ল, এই ক্লাস টি ছিল চীনা ভাষা শিখার কোর্সের প্রথম ক্লাস।

যাইহোক, আবার নতুন গানের সুর শুনতে পেলাম সবাই, আর এবার আমাদের শিক্ষক বললেন, এখন আমরা ১০ মিনিট ব্রেক নিব, অনেক শিক্ষার্থী নিজের ব্যাগ নিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল, আমি ভাবলাম তারা মনে হয় আর ক্লাসে আসবে না! যাইহোক, আমি ও ক্লাস থেকে বের হলাম একটু হাঁটা-হাটি করতে, একা একা অন্য ক্লাস গুলির সামনে দিয়ে হাটতেই যা দেখলাম তা অনেক মুগ্ধ করার মত, তা হল, এই ব্রেক এর সময় কিছু শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে খুবই বন্ধু সুলভ আলোচনা করছেন, কেউ হাঁসি বা কেউ বই নিয়ে কিছু বুঝাচ্ছেন, আবার কোন ক্লাসে শিক্ষক বসে আছে সব শিক্ষার্থীদের মাঝে, এ যেন শুধু ব্রেক টাইম নয়, শিক্ষক- শিক্ষার্থীদের আনন্দের সময়। প্রসঙ্গ কারনেই বলে রাখি, চীনে ক্লাস এর সময়, ব্রেক এর সময় সব কিছু কেন্দ্রিয় ভাবে নিয়ন্ত্রন করা হয়। তাই

সব ক্লাস একই সময় ব্রেক টাইম দেয়, যদিও কোন কোর্স কতক্ষন তা নির্ভর করে সেই বিভাগের উপর,কিন্তু এক দিনের ক্লাস শুরু ও শেষ একটি নির্দিস্ট সময়ে হয়।

যাইহোক, আমি ব্রেক টাইমে, বারান্দা দিয়ে হাটতেছিলাম, আর দেখলাম, সব শিক্ষার্থীদের মাঝে যেন এক আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে, সবাই অনেক হাসিঠাট্টা -তে মেতে আছে, যদিও এক-এক জন এক-এক দেশের, এর মাঝেই বাংলাদেশী কিছু শিক্ষার্থীদের সাথে পরিচয় হল, আরো মিশর, থাইল্যান্ড, আফ্রিকার কিছু শিক্ষার্থীদের সাথেও পরিচয় হয়ে গেল। আর কিছুক্ষণ এর মাঝেই সেই প্রথম গানের সুর শুনতে পেলাম আর মুহুর্তেই সবাই যার যার ক্লাসে চলে গেল, মানুষে পরিপুর্ন বারান্দা এখন একবারেই জনমানবহীন হয়ে পড়ল। আমিও ক্লাসে চলে আসলাম, দেখলাম ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ঢুকতে, আবার ক্লাস শুরু হল, আর কিছুক্ষন পর একটি নামের তালিকা আমার হাতে দেয়া হল, কারন আমি সামনের সারিতেই বসেছিলাম, আর শিক্ষক বললেন এটিতে যারা যার নামের পাশে সাক্ষর করতে, এটাই উপস্থিতি হিসেবে গননা করা হবে, তিনি নিজে মোট শিক্ষার্থী ও সাক্ষর মিলিয়ে দেখবেন, মাঝের যে কোন এক জনকে দাড়াতে বলতেও পারেন! আমার কাছে ভালই লাগলো পদ্ধতিটি, এতে সময় অপচয় কম হয় আর মূল্যায়ন ও ভাল হয়, আমার মতে।

আমরা আবার একটি গানের সুর শুনতে পেলাম, আর আমাদের প্রথম ক্লাস টি শেষ হল, আমার দেশের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ক্লাস। সব ক্লাস শেষে আমরা সব নতুন সহপাঠিরা একসাথে দল বেধে বের হলাম, সবাই যার যার মত বিদায় নিলাম, শেষ এর দিকে আমরা তিন-চার জন এক ছাত্রাবাস এর হওয়ায়, এক সাথে ক্যাম্পাস ঘুরে দেখার জন্য সিধান্ত নিলাম। সবুজে ঘেরা ক্যাম্পাস, প্রসস্থ রাস্তা, সুউচ্চ ও সুন্দর ভবন, আর চার দিকে সাজানো-গোছানো, পরিস্কার অনন্য সুন্দর এক ক্যাম্পাস।

মুগ্ধ হয়ে ক্যাম্পাস দেখছিলাম, আর নিজের স্বপ্নগুলি পুরণের পথ খুজছিলাম। এভাবেই কেটে গেল বিদেশে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার প্রথম দিন।

ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান শিহাব
পিএইচডি গবেষক,
ক্যাপিটাল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বেইজিং, চীন।

পিএইচডি রিসার্চ : নতুন একশিক্ষা পাসপোর্ট

বর্তমানে আমরা একটি প্রবণতা লক্ষ্য করছি বাংলাদেশের মানুষের মাঝে। সেটা হচ্ছে, বয়স-পেশা নির্বিশেষে সব মানুষ ইউরোপ,আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ উন্নত দেশগুলোতে মাইগ্রেট করতে চায়। বিষয়টা দোষের কিছু নয়। উন্নত একটা সিস্টেমে, উন্নত দেশে একটা সুন্দর জীবন হোক, সেটা যে কেউ চাইতেই পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, উন্নত দেশের মাইগ্রেশন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনেক ব্যয়বহুল যেটা আমাদের দেশের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত মানুষদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। বছরের পর বছর অনেকেই চেষ্টা করতে থাকে বিদেশে উচ্চশিক্ষার পথ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সেই দেশে থিতু হওয়ার। এক সময় হয়তো সেই সুযোগ সামনে চলে আসে। কাঙ্ক্ষিত দেশের কোন একটি ইউনিভার্সিটিতে উচ্চতর ডিগ্রি প্রোগ্রামে তারা ভর্তি হয়। প্রথম বছর কিংবা প্রথম সেমিস্টারের টিউশন ফি ভর্তি হওয়ার সাথে সাথেই দিয়ে দিতে হয়। এক বুক স্বপ্ন নিয়ে তারা পাড়ি দেয় নতুন দেশে। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী বিদেশে তাদের পড়াশোনা চলাকালীন part-time কাজের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় এবং বাকি টিউশন ফি যতটুকু সম্ভব বহন করা যায়, সেটারই চেষ্টা করতে থাকে। কেউই চায় না দেশ থেকে আবার টাকা নিয়ে টিউশন ফি দিতে। এজন্য এক অমানুষিক পরিশ্রমের পথ তারা বেছে নেয়। কিন্তু এইসব দেশে আসলে পড়াশোনার যেই স্ট্যান্ডার্ড, কোর্সওয়ার্কের যেমন প্রেসার - তাতে স্টুডেন্ট অবস্থাতে অতিরিক্ত টাকা আয়ের চিন্তা করতে গিয়ে অনেকেরই পড়াশোনায় ভালো করতে হিমশিম খেতে হয়।

এক্ষেত্রে ভালো একটি বিকল্প হতে পারে রিসার্চ-বেসড মাস্টার্স অথবা পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হয়ে বিদেশে পড়তে যাওয়া। এই ধরনের প্রোগ্রামগুলোতে মূলত ভর্তি হওয়া স্টুডেন্টটির যাবতীয় থাকা-খাওয়া, টিউশন ফি এবং আনুষঙ্গিক খরচ ইউনিভার্সিটি এবং তার সুপারভাইজার (প্রফেসর) বহন করে থাকেন। দেশভেদে এই স্কলারশিপ এবং ফান্ডিং এর পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে কিন্তু একটা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড সবখানে মেইনটেইন করা হয়। তুলনামূলকভাবে পিএইচডি প্রোগ্রামে ফান্ডিং এবং স্কলারশিপ বেশি থাকে। তাই পিএইচডি হয়ে উঠেছে নতুন এক শিক্ষা পাসপোর্ট!

উন্নত বিশ্বের একটি দেশে ভাল একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুল-ফান্ডেড পিএইচডি স্কলারশিপ নিশ্চিত করতে বেশ ভাল রকমের প্রস্তুতি প্রয়োজন। এর জন্য লম্বা সময় নিজেকে তৈরি করতে হবে। কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণায় প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন পিএইচডি এডমিশনের মূল শর্ত। যদিও বাংলাদেশ গবেষণা সংস্কৃতিতে বরাবরই পিছিয়ে আছে, সাম্প্রতিক সময়গুলোতে বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী নিজ কর্মউদ্দীপনায় নিজেদেরকে গবেষণায় দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলছে। ছোট ছোট কিছু ব্যক্তি উদ্যোগে গবেষণা গ্রুপ তৈরি হয়েছে যারা ভালো কিছু কাজ করার চেষ্টা করছে স্বল্প সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও। বাংলাদেশে এখন নিয়মিতভাবে অনেক ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হচ্ছে IEEE, Springer সহ আরো বিভিন্ন নামিদামি সাইন্টিফিক পাবলিশার্স এর। এইসব কনফারেন্স এবং বিভিন্ন জার্নালে রিসার্চ পেপারের পাবলিকেশনের

মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী গবেষক হিসেবে নিজের একটা প্রোফাইল তৈরি করতে পারে। গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে দেশে বসেও অন্যান্য দেশের বড় বড় সাইন্টিস্ট, প্রফেসর এবং স্টুডেন্টদের সাথে কোলাবরেশনে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। ছোট ছোট কিছু সমস্যা নিয়ে কাজ করার এবং সিস্টেমেটিক এপ্রোচের মাধ্যমে অর্জন করা গবেষণার অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে পিএইচডি ডিগ্রীতে এডমিশন পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে।

ঠিক এই কাজগুলোই করছে আমাদের পাশের দেশ ভারত, কিংবা চীন এবং ইরানের ছাত্ররা। আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ কিংবা অস্ট্রেলিয়াতে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতি বছরই বেশ ভালো সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে স্কলারশিপ দিয়ে পিএইচডি গবেষক হিসেবে নিয়ে আসে। এই দেশগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবেই জানে এবং সেভাবেই নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে থাকে যেন তারা সেই স্কলারশিপগুলোর জন্য মনোনীত হতে পারে। সেই তুলনায় বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রী পিএইচডি প্রোগ্রামগুলোতে কম। যেহেতু আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী যারা বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য আসতে চায় কিন্তু অর্থনৈতিক একটা চিন্তা থাকে কিভাবে তারা বাহিরে পড়তে আসতে পারে, সে ক্ষেত্রে তাদের উচিত এই স্কলারশিপগুলোর সুযোগ নেয়া এবং পিএইচবি প্রোগ্রামের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। ইউনিভার্সিটিগুলো স্কলারশিপ নিয়ে বসে আছে, তারা যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদেরই খুঁজছে। এখন আমাদেরকেই সেই সুযোগটা লুফে নিতে হবে!

পিএইচডি গবেষকেরা অনেকটা বিশ্বনাগরিকের মত। সারা পৃথিবী তার জন্য খোলা। এই পৃথিবী জ্ঞানীদের এবং যারা জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত তাদের জন্য অবারিত, উন্মুক্ত। সাথে এটাও মনে রাখা দরকার, উচ্চশিক্ষার গন্তব্য কিছু দেশকে ঘিরেই শুধু চিন্তা করা উচিত নয়। চিন্তা রাখা উচিত কোন দেশে গেলে আমি ভালোভাবে শিখতে পারবো। ব্যাচেলর এর পরে ইউরোপ আমেরিকায় মাস্টার্সের জন্য না গিয়ে এশিয়ার উন্নত দেশগুলোতেও মাস্টার্স করে গবেষণার সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়া যেতে পারে। যেহেতু আমাদের দেশের শিক্ষকদের সাথে বাহিরের দেশের শিক্ষকদের সেইভাবে শক্ত কোন কোলাবরেশন নেই, চায়না-জাপান-কোরিয়া-মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর এই দেশগুলোতে মাস্টার্স করলে সেখানকার প্রফেসরদের কাছ থেকে পাওয়া রেকমেন্ডেশন নিয়ে নর্থ আমেরিকা কিংবা ইউরোপে পিএইচডি করতে যাওয়াটা বেশ সহজ হয়ে যায়। ঠিক এই বিষয়টা আমার নিজের ক্ষেত্রেও হয়েছে। আমার মাস্টার্সের সুপারভাইজার এর কাছ থেকে পাওয়া সরাসরি রেকমেন্ডেশনে আমি আজকে কানাডায় পিএইচডি করছি। তাই আমি চাইবো বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের সাধক হবে, নিজেদের গবেষক হিসেবে তৈরি করে নিজ দেশ এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারে আসবে। নিজের পিএইচডি গবেষক পরিচয় এর মাধ্যমে সারা বিশ্বের নাগরিক হয়ে উঠবে।

সাকিব সৌরভ

পিএইচডি ছাত্র, ইনফরমেশন এন্ড সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারিং,
কনকরডিয়া ইউনিভার্সিটি, মন্ট্রিল, কানাডা।

এক ঝলকে দক্ষিণের কেন্দ্রীয় ক্যাম্পাস! সেন্ট্রাল সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, চীন

জ্ঞান তৈরি কর, এবং সমাজকে বিকশিত করার প্রত্যয়ে (Create Knowledge and Serve Society) সেন্ট্রাল সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের Central South University (CSU) পথ চলা দুর্গম গতিতে বেগবান হচ্ছে। এটি চীনের হুনান প্রভিন্সের চাংশা শহরে (Changsha, Hunan) অবস্থিত একটি জাতীয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। চীনা ভাষায় লেখা এর নাম হয়, 中南大学 । বিশ্ববিদ্যালয়টি চীনের শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের সাথে অনুমোদিত প্রকল্প 985, প্রকল্প 211, এবং ডাবল একটি উদীয়মান প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়। এটি 3,810,000 বর্গ মিটার (প্রায় 392.4 হেক্টর) এলাকা জুড়ে ছয়টি ক্যাম্পাসের সমন্বয়ে পরিবেষ্টিত। ক্যাম্পাসগুলির এলাকার পাশে রয়েছে মনোরম শিয়াং নদী (Xiang River) এবং ইতিহাসিক ইউয়েলু পাহাড় (Yuelu Hill)। ছাত্রছাত্রীদের জন্য এর লাইব্রেরিতে প্রায় 4,390,000 সংখ্যক এর বেশি পুস্তক এবং নথিকা ভলিউমের সংগ্রহ রয়েছে। সবুজের সমারোহে ঘেরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ থেকেও অনেক ছাত্রছাত्री পড়ালেখার জন্য আসেন ।

2000 সালের এপ্রিলে, হুনান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (湖南医科大学), চাংশা রেলওয়ে কলেজ (长沙铁道学院), এবং সেন্ট্রাল সাউথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিভার্সিটি (中南工业大学) একীভূত হয়ে আজকের সেন্ট্রাল সাউথ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পায় । চাংশা শহরের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে, এখানেই CSU ক্যাম্পাস অবস্থিত। শহরটি তার ঐতিহাসিক স্থান, ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং প্রাণবন্ত স্থানীয় রীতিনীতির জন্য পরিচিত।

CSU এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আলিঙ্গন করে এবং
প্রচার করে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতার সুযোগ প্রদান করে।

এর বিভিন্ন ক্যাম্পাসসমূহের বিন্যাস কাঠামো অনেক সাজানো ও পরিমার্জিত করে পরিচালিত হচ্ছে, যেমন-

- **প্রধান ক্যাম্পাস :** বেশিরভাগ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের জুনিয়র স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরদের জন্য ডরমিটরি এবং একাডেমিক ভবন, দুটি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগার, পাশাপাশি অফিস ভবন আছে । এখানেই আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও অন্যান্য কাজের জন্য একাডেমিক অফিস (কক্ষ নং-২১১) রয়েছে । পোস্টডক্টরাল গবেষকদের জন্য যাবতীয় অফিসিয়াল সহযোগিতা এই প্রধান ক্যাম্পাস বিল্ডিং-১ থেকে করা হয় ।
- **দক্ষিণ ক্যাম্পাস :** সমস্ত মানবিক স্কুলের সকল নবীন এবং স্নাতকোত্তরদের জন্য ডরমিটরি, সেইসাথে অফিস ভবন আছে। এছাড়াও, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পড়তে আসা বেশীরভাগ ছাত্রছাত্রীদের জন্য এখানে খুব উন্নত মানের ২'টি সাততলা মাপের আবাসিক ভবন আছে ।
- **নতুন ক্যাম্পাস :** সমস্ত নবীন এবং সমস্ত মানবিক এবং বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তরদের জন্য একাডেমিক ভবন, সেইসাথে অফিস এবং বিশাল বড় লাইব্রেরি ভবন এখানে রয়েছে ।
- **শিয়াংয়া স্কুল অফ মেডিসিন (নতুন ক্যাম্পাস) :** জিয়াংয়া হাসপাতাল এবং চীনের মেডিকেল জেনেটিক্সের স্টেট কী ল্যাবরেটরি সহ মেডিকেল স্নাতকোত্তরদের জন্য ছাত্রাবাস এবং একাডেমিক ভবন।

❖ **শিয়াংয়া স্কুল অফ মেডিসিন (পুরাতন ক্যাম্পাস) :** মেডিকেল স্নাতকদের জন্য ডরমেটরি এবং একাডেমিক ভবন, তৃতীয় জিয়াংয়া হাসপাতাল এবং

মেডিকেল লাইব্রেরি সহ। সেই ধারাবাহিকতায়, এর ইতিহাস 1903 সালের, যখন হুনান মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

❖ **রেলওয়ে ক্যাম্পাস :** সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আর্কিটেকচারের জুনিয়র স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরদের জন্য ডরমেটরি এবং একাডেমিক ভবন, সেইসাথে অফিস এবং আরও একটি লাইব্রেরি ভবন আছে ।

হুনান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কলেজ দ্বারা সম্পাদিত 100 বছরের খনিজ বা মাইনিং অধ্যয়নের জন্য, CSU ভূতত্ত্ব এবং খনির থেকে ধাতুবিদ্যা, উপকরণ বিজ্ঞান এবং যন্ত্রপাতি প্রকৌশল পর্যন্ত অলৌহঘটিত ধাতুগুলির চারপাশে সারাবিশ্বে ভালো একাডেমিক ক্লাস্টার তৈরি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল র‍্যাঙ্কিং মাপকাঠিতে পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এটি একটি উদীয়মান ভাল মানের শিক্ষাবান্ধব প্রতিষ্ঠান, যেমন- US News Ranking: 209 (2023), QS Ranking: 452 (2024), THES Ranking: 351–400 (2023), ARWU Ranking: 95 (2023) ।

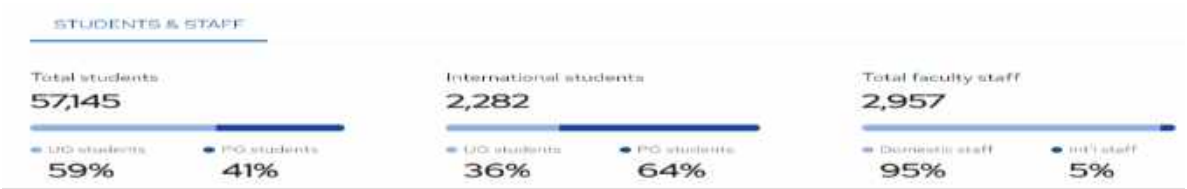

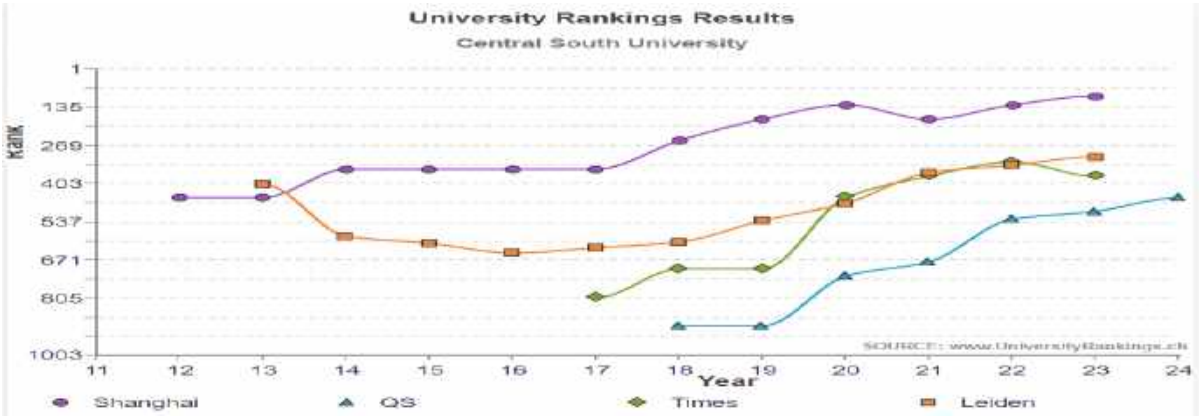

এরই ফলস্বরূপ এখান থেকে শিল্প অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, বিশ্ববিদ্যালয় ফলিত গবেষণা, ইন্টার্নশিপ, এবং সমবায় শিক্ষা কার্যক্রম প্রচার করে। এই সহযোগিতা শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে, ফ্যাকাল্টিদের শিল্প চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার অনুমতি দেয় এবং সমাজের উপকারে প্রযুক্তি স্থানান্তরকে সহজ করে। বিশ্ববিদ্যালয়টি নিজস্ব বিভিন্ন একাডেমিক জার্নাল প্রকাশ করে। কিছু উল্লেখযোগ্য জার্নালের মধ্যে রয়েছে "Journal of Central South University," "Tranzactions of Nonferrous Metals Society of China," "Chinese Journal of Cancer Research," এবং "Journal of Central South University (Medical Sciences)"।

একাডেমিক প্রোগ্রাম : CSU একটি প্রাণবন্ত এবং গতিশীল ছাত্র জীবনের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এটি বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, ক্লাব এবং শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত করার জন্য পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম অফার করে। CSU বিজ্ঞান, প্রকৌশল, চিকিৎসা, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি, আইন, কলা এবং সামাজিক বিজ্ঞান সহ বিভিন্ন শাখায় একাডেমিক প্রোগ্রাম অফার করে। এটিতে অসংখ্য স্নাতক, স্নাতক এবং ডক্টরাল প্রোগ্রাম রয়েছে। এটি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বৃদ্ধির জন্য অসংখ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পরীক্ষাগার এবং কেন্দ্র স্থাপন করেছে। মেধার উৎকর্ষ বিকাশে বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টির। এই কেন্দ্রগুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডেটা, শক্তি এবং পরিবেশ বিজ্ঞান, উন্নত এবং নির্ভুল ওষুধের মতো ক্ষেত্রে আন্তঃবিষয়ক সহযোগিতা এবং উন্নত গবেষণার প্রচার করে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা : সেন্ট্রাল সাউথ একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, যা সক্রিয়ভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রচার করে এবং বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি এবং রাশিয়ার মতো 30 টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে 200 টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়াও ব্যাপকভাবে জড়িত রয়েছে শিল্প-বিশ্ববিদ্যালয়-গবেষণা সহযোগিতা এবং বহুজাতিক উদ্যোগের সাথে। বাংলাদেশসহ প্রায় 100 টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলের বিদেশী শিক্ষার্থীরা এখানে পড়াশোনা করে। এটি অনুষদ এবং ছাত্র বিনিময় প্রোগ্রাম, যৌথ গবেষণা প্রকল্প, এবং একাডেমিক সহযোগিতা উৎসাহিত করে।

বৃত্তি এবং আর্থিক সহায়তা : CSU দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এই বৃত্তিগুলি একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দেয়, বৈচিত্র্যের প্রচার করে এবং নিশ্চিত করে যে যোগ্য শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষার অ্যাক্সেস রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি গবেষণা প্রকল্প এবং একাডেমিক উদ্যোগের জন্য বিভিন্ন অর্থায়নের সুযোগও সরবরাহ করে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে প্রায় ৪০ জনের অধিক বাংলাদেশী মেধাবী ছাত্রছাত্রী এখানে অধ্যয়নরত আছে। তারা সবাই পড়ালেখায় সমানভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে পদচারনায় নিজেরদের যোগ্য করে তুলছে নতুন শুভদিনের প্রত্যাশায় ।

ক্যাম্পাস জীবন, সাংস্কৃতিক এবং খেলাধুলা কার্যক্রম : বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক উৎসব, শিল্প প্রদর্শনী, সঙ্গীত পরিবেশনা এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। শিক্ষার্থীরা শিল্প, খেলাধুলা, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার্থী নিজের শখের প্রতি নিবেদিত বিভিন্ন ক্লাব এবং সংগঠনে অংশগ্রহণ করতে পারে। এটিতে আধুনিক শ্রেণীকক্ষ, গবেষণা কেন্দ্র, ক্রীড়া কমপ্লেক্স, ছাত্র ছাত্রাবাস এবং বিনোদনের স্থান সহ ভালভাবে ডিজাইন করা ক্যাম্পাস সুবিধা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া এবং সহযোগিতার সুবিধার্থে প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলনী, নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট এবং ক্যারিয়ার মেলার আয়োজন করে। এই হুনান প্রভিন্সে আরও কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে যেখানে বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী আছে, মাঝে মধ্যে ক্রিকেটের মত জাঁকজমকপূর্ণ খেলায় তারা অংশগ্রহণ করে থাকে। এদের মধ্যে এই সেন্ট্রাল সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট টিমের অবস্থান অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা যায়।

গ্রীষ্ম/শীতকালীন স্কুল : CSU গ্রীষ্মকালীন এবং শীতকালীন স্কুলগুলি সংগঠিত করে যা স্বল্পমেয়াদী নিবিড় একাডেমিক প্রোগ্রাম প্রদান করে। এই স্কুলগুলি বিভিন্ন দেশের ছাত্র এবং পণ্ডিতদের আকর্ষণ করে এবং বিশেষ কোর্স, কর্মশালা এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা প্রদান করে। প্রোগ্রামগুলি অংশগ্রহণকারীদের তাদের জ্ঞান প্রসারিত করার, আন্ত-সাংস্কৃতিক বিনিময়ে নিযুক্ত হওয়ার এবং CSU-এর প্রাণবন্ত একাডেমিক পরিবেশের অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

সেন্ট্রাল সাউথ ইউনিভার্সিটি শিক্ষা, গবেষণা এবং সমাজের পরিবর্তিত চাহিদার সাথে বিকশিত হচ্ছে এবং মানিয়ে চলেছে। একাডেমিক উৎকর্ষতা, উদ্ভাবন এবং বিশ্বব্যাপী সম্পৃক্ততার প্রতি প্রতিশ্রুতি সহ জ্ঞানের অগ্রগতি এবং সমাজের উন্নতিতে অবদান রাখছে, যা চীনসহ পৃথিবীর সামগ্রিক শক্তিতে দুর্দান্ত অগ্রগতির প্রভাব সমুন্নত রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কাওসার আহমেদ
পিএইচডি ফেলো,
ফলিত পরিসংখ্যান,
স্কুল অফ ম্যাথমেটিক্স এন্ড স্ট্যাটিসটিক্স,
সেন্ট্রাল সাউথ ইউনিভার্সিটি, হুনান, চীন।

চীনে পিএইচডি কেন করবেন?

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) আজ থেকে হাজার বছর আগে বলেছিলেন, "জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাও"। অত্যন্ত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও তাৎপর্যপূর্ণ এই কথাটির মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারি ২০১৬ সালে যখন আমি চীনে পিএইচডি করতে আসি। প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, আমি চীনা ভাষায় পিএইচডি করেছিলাম কিনা। কারন চীনের বাইরে, বিশেষ করে বাংলাদেশের অনেকেরই ধারনা চীনে পড়তে হলে বোধ হয় চীনা ভাষাতেই পড়তে হয়। কিন্তু আমি ইংরেজি মাধ্যমের পিএইচডি প্রোগ্রামে এসেছিলাম। এ কথা সত্য যে চীন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি মাধ্যমের পিএইচডি প্রোগ্রাম শুরু করেছে খুব বেশিদিন হয়নি। সম্ভবত ৭-৮ বছরের বেশি না।

কিন্তু আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রী তাঁরা বহু আগে থেকেই নিয়ে আসছে। বর্তমানে চীন সরকার উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে (বিশেষ করে মাস্টার্স ও পিএইচডি) ইংরেজি মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ডিগ্রী কার্যক্রম শুরু করার কারনে অনেক নবীন শিক্ষার্থী পিএইচডি ডিগ্রী নিতে আসছে। এছাড়াও বাংলাদেশের অনেক শিক্ষক, বিজ্ঞানী ও সরকারী কর্মকর্তা গণ এখন চীনে আসছে পিএইচডি করার জন্য। চীনে পিএইচডি করতে আসার আগে একটি কথা প্রায় সবারই শুনতে হয়, "চীনে পিএইচডি কেন করবেন?" এই "কেন" এর উত্তরগুলো তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য।

চীনে পিএইচডি করতে আসার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারন হলো বৃত্তি। একজন পিএইচডি গবেষকের পক্ষে বৃত্তি ছাড়া গবেষণা করা খুব কঠিন। চীন সরকার বিভিন্ন রকম বৃত্তি প্রদান করে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় "চীনা সরকারি বৃত্তি" ইংরেজিতে যা Chinese Government Scholarship নামে পরিচিত। এই বৃত্তি সাধারণত দু ধরনের হয়ে থাকে। একটি বৃত্তির প্রজ্ঞাপন সরাসরি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারি হয়। অন্যটি চীনা বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি প্রজ্ঞাপন জারি করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বৃত্তির যেই প্রজ্ঞাপন হয় সেখানে মন্ত্রণালয় থেকে প্রাথমিক প্রার্থী নির্ধারন করা হয়। পরে চীনা দূতাবাসের সাক্ষাৎকার এর ভিত্তিতে চূড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারি বৃত্তির যেই প্রজ্ঞাপন জারি করে, সেখানে সরাসরি আবেদন করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় যোগ্য প্রার্থীর তালিকা তৈরি করে চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর নিকট প্রেরণ করে। সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে।

একজন পিএইচডি শিক্ষার্থীর চীনা সরকারি বৃত্তির পরিমাণ মাসে ৬২,০০০ টাকার মতো। এছাড়া টিউশন ফি, ও আবাসন এর জন্য কোনো বাড়তি খরচ নেই। চীনে সাধারণত খাওয়া দাওয়া ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে মাসে ১৬,০০০ টাকা যথেষ্ট। তাই বলা যায়, বৃত্তির পরিমান নেহাতই কম নয়। চীনা সরকারি বৃত্তি ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব বৃত্তি কার্যক্রম রয়েছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ এই বৃত্তির পরিমান কম হলেও, চীনে জীবন নির্বাহ করার জন্য যথেষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক বৃত্তি ছাড়াও রয়েছে প্রাদেশিক সরকারের বৃত্তি ও কিছু বিশেষ বৃত্তি। চীনে পিএইচডি এর সবচেয়ে বড় বৃত্তি হলো "ANSO Scholarship for Young Talents"। এই বৃত্তির পরিমান মাসিক ৯২,০০০-১,০০,৭০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। এছাড়া আরো অনেক সুবিধা রয়েছে।

স্বাভাবিক পাঠ গ্রহণ করার পাশাপাশি একজন পিএইচডি শিক্ষার্থীকে তার তত্বাবধায়কের অধীনে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা এসব গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের কাছ থেকে অর্থ বরাদ্দ পেয়ে থাকেন। উদাহরন স্বরূপ National Natural Science Foundation of China (NSFC) এর কথা বলা যায় যেখান থেকে অধ্যাপকরা বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার জন্য অর্থ পেয়ে থাকেন।

অধ্যাপকরা তাঁর অধীনে প্রকল্প ভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাস্টার্স/পিএইচডি শিক্ষার্থীদের একটি গ্রুপ তৈরি করে দেন, যারা গবেষণার ফলাফল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জার্নাল ও কনফারেন্স পেপারের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। অনেক অধ্যাপক এইসব প্রকল্প থেকে মাস্টার্স ও পিএইচডি গবেষকদের কিছু টাকা পারিশ্রমিক হিসেবেও দিয়ে থাকেন।

চীনে প্রায় ১,১০০ টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই মানসম্পন্ন। আবার কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। গত ৩-৪ বছর ধরে এই মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার প্রমাণ হলো আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং-এ চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান শক্ত হওয়া। জাতীয়ভাবে চীনের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়কে অভিজাত শ্রেণীর অর্থাৎ সবচেয়ে মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ধরা হয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে C9 লিগ বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়ে থাকে। এই ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়া চীনে প্রজেক্ট ৯৮৫ ও প্রজেক্ট ২১১ নামে দুটি প্রকল্প চালু রয়েছে। প্রজেক্ট ৯৮৫ এর অধীনে ৩৯টি ও প্রজেক্ট ২১১ এর অধীনে ১০০ টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয় নতুন নতুন গবেষণাগার তৈরি, আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন, আন্তর্জাতিক ও খ্যাতিসম্পন্ন গবেষকদের আমন্ত্রণ, চীনা শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষন প্রভৃতি এর ব্যবস্থা করে থাকে। মানের দিক থেকে বিবেচনা করলে প্রজেক্ট ৯৮৫ এর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সবচেয়ে মানসম্পন্ন। আর এর পরের অবস্থানেই প্রজেক্ট ২১১ এর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, C9 লিগ এর অন্তর্ভুক্ত ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রজেক্ট ৯৮৫ ও প্রজেক্ট ২১১ এর অধীনে।

সামগ্রিকভাবে একজন পিএইচডি প্রার্থীকে আবেদনের সময় এই ১৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয়কে আদর্শ হিসেবে ধরে নিতে হবে। কারন, এই ১৩৯ টি বশ্বিবদ্যিালয়ে প্রকৃত গবেষণা হয়ে থাকে। শিক্ষা ও গবেষণা বিস্তারে চীন সরকার নতুন নতুন নীতিমালা গ্রহণ করছে। ২০১৫ সালের আগষ্ট মাসে চীন সরকার "World Class 2" (যা "Double World Class Project" নামেও পরিচিত) নামে নতুন প্রকল্প হাতে নেয়। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে C9 লিগ এর ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬টিকে আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং-এ প্রথম ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাতারে ২০৩০ সালের মধ্যে নিয়ে আসা। এসব তথ্য একজন পিএইচডি প্রার্থীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একজন পিএইচডি গবেষকের বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল গবেষণার জন্য প্রয়োজন একটি আধুনিক ও সুসজ্জিত গবেষনাগার। চীনের মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রয়েছে সেইসব গবষেণাগার। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র। এইসব গবেষণাগার ও গবেষণাকেন্দ্র সাধারনত সরকারি অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত

হয়ে থাকে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানীও এইসব গবেষণাগার ও

গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থ দিয়ে থাকে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব গবেষণাগার ও গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। যে সমস্ত গবেষণাগার কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সরাসরি অর্থ সহযোগীতা পেয়ে থাকে সেই সমস্ত গবেষণাগারকে চীনে "State Key Laboratory" বলা হয়। মূলত জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এখানে হয়ে থাকে।

বিশ্বায়নের এই যুগে চীন তার শিক্ষাব্যবস্থা ও গবেষণাকে আন্তর্জাতিকীকরণে বিশ্বাসী। এই লক্ষ্যে চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন দেশের সাথে যৌথ উদ্যোগে গবেষণা কেন্দ্র (Research Centre) প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। উদাহরনস্বরূপ "China-EU Institute for Clean and Renewable Energy" এর কথা বলা যায় যেটি Huazhong University of Science & Technology বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন চীন ও ইউরোপের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এরকম অনেক গবেষণা কেন্দ্র চীনের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে।

গবেষণায় একটি দেশ ভাল না মন্দ, তা যাচাই করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে প্রকাশনা। নেচার ইনডেক্স (Nature Index) প্রতিবছর উচ্চমানের প্রকাশনা সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের একটি র‍্যাংকিং করে থাকে, যা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গবষেণার অবস্থান পর্যালোচনা করা হয়। ২০২৩ সালের র‍্যাংকিং অনুসারে চীন ১৯৬ টি দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করে। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নেচার ইনডেক্স এর সাম্প্রতিক র‍্যাংকিং একটি ধারণা দেয় যে সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন চীন অর্থনীতির পাশাপাশি গবেষণায়ও বিশ্বকে নেতৃত্ব দিবে। তাই বলা যায় একজন পিএইচডি প্রার্থীর জন্য বর্তমানে চীন একটি আদর্শ দেশ।

একজন পিএইচডি গবেষকের গবেষণার পাশাপাশি পেশাগত দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত ক্লাস ও গবেষণার ফাঁকে একজন পিএইচডি গবেষককে গবেষণার কৌশল রপ্ত করতে হয়। চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেহেতু পিএইচডির সময় গবেষণার ওপর বেশি জোর দেয়, তাই গবেষণা কৌশল আয়ত্ত করার একটি বড় সুযোগ এখান থেকে পাওয়া যায়। পিএইচডি গবেষণাকালীন গবেষণা প্রকল্প কিভাবে লিখতে হয় তাও শেখা যায়।

এছাড়াও গবেষণার ফলাফল নিয়মিতভাবে গ্রুপ মিটিংয়ে তুলে ধরতে হয়। চীনে একজন পিএইচডি গবেষককে এসব কাজ দৈনন্দিন কর্মসূচির মতোই করতে হয়। ফলে একজন পিএইচডি গবেষকের গবেষণা ও উপস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, যা সামগ্রকিভাবে তার পেশাগত দক্ষতাকে বৃদ্ধি করে। বর্তমানে চীন প্রচুর আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। একজন পিএইচডি গবেষকের এ সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করার সুযোগ থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে তত্তাবধায়ক নিজেই অর্থ ব্যয় করে পিএইচডি গবেষককে কনফারেন্স ও প্রশিক্ষনের জন্য প্রেরণ করে থাকেন। তাই বলা যায় যে চীনে একজন পিএইচডি গবেষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ অপরিসীম।

বর্তমানে বিদেশিদের জন্য চীনে পিএইচডির পর চাকরির সুযোগ রয়েছে। পিএইচডির পর পোস্টডক্টোরাল ফেলো হিসেবে গবেষণার সুযোগ

এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ রয়েছে। তবে একাডেমিক চাকরি অনেক প্রতিযোগিতাপূর্ণ।

একাডেমিক চাকরিতে সুযোগ পেতে হলে চাকরি প্রত্যাশীকে অবশ্যই পিএইচডি কালীন সময়ে গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে হবে। এছাড়াও চীনে রয়েছে বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ। সাধারণত এইসব কোম্পানির রিসার্চ এন্ড ডেভেলোপমেন্ট শাখায় পিএইচডি ধারীদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এছাড়া কারো যদি চীনা ভাষায় দক্ষতা থাকে তাহলে চাকরি পাওয়া অনেকটা সহজ হয়ে যায় ।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনে বৃত্তির আবেদনের সংখ্যা প্রচুর পরিমানে বেড়েছে। একই সাথে বেড়েছে প্রতিযোগিতা। তাই সাম্প্রতিক কালে লক্ষ্য করা যায় যে চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পিএইচডি প্রার্থী নির্বাচন করছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবেদনের সময় একজন পিএইচডি প্রার্থীর একাডেমিক প্রোফাইল এর সাথে ভালো মানের জার্নালে ভালো গবষেণা পত্র থাকা খুবই জরুরী। তা না হলে প্রতিযোগিতার দৌড়ে পিছিয়ে পড়তে হতে পারে।

ড. তাওসিফ আলী

পোস্টডক্টোরাল রিসার্চ ফেলো, বেইজিং ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, বেইজিং, চীন।

সহকারী অধ্যাপক (শিক্ষাছুটি), উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

নর্থ চায়না ইলেকট্রিক পাওয়ার ইউনিভার্সিটি : এনার্জি এডুকেশন এবং ইনোভেশনে একটি উজ্জ্বল নাম

"বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজটি কেবল অর্থ উপার্জন শেখানো, বা সরকারী বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক সরবরাহ করা বা ভদ্র সমাজের কেন্দ্র হওয়া নয়; এটি সর্বোপরি, বাস্তব জীবনের মধ্যে সেই সূক্ষ্ম সমন্বয়ের অঙ্গ হওয়া এবং জীবনের ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের একটি সমন্বয় যা সভ্যতার রহস্য গঠন করে।" - *ডব্লিউ.ই. বি ডু বোইস*

নর্থ চায়না ইলেকট্রিক পাওয়ার ইউনিভার্সিটির (এনসিইপিইউ) একজন স্নাতক ছাত্র হিসেবে, আমি এই সম্মানিত প্রতিষ্ঠানের একজন অংশ হতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত। এনসিইপিইউ হল একটি জাতীয় মূল বিশ্ববিদ্যালয় যা সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধীনে, এর প্রধান ক্যাম্পাস বেইজিংয়ে এবং একটি শাখা ক্যাম্পাস হেবেই প্রদেশের বাওডিং-এ অবস্থিত। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টি চীনের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং বছরের পর বছর ধরে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন করে যাচ্ছে ।

ঐতিহাসিক পটভূমি এবং মিশন :

এনসিইপিইউ (NCEPU) শিক্ষা মন্ত্রনালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলের যৌথ প্রশাসনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে ১২টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি রয়েছে, যেমন চীনের স্টেট গ্রিড কর্পোরেশন। তার ইতিহাস জুড়ে, এনসিইপিইউ শক্তি ও বিদ্যুৎ শিল্পের জন্য অত্যন্ত দক্ষ প্রতিভা গড়ে তোলা এবং এই ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে অবদান রাখার লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক অসাধারণতা :

ইউনিভার্সিটি 12টি স্কুল নিয়ে গঠিত যা মোট 64টি স্নাতক মেজর অফার করে, যার মধ্যে বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, এনার্জি পাওয়ার এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কন্ট্রোল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইকোনমিক্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে। এনসিইপিইউতে স্নাতক, মাস্টার্স এবং ডক্টরেট শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি ব্যাপক ব্যবস্থা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প-গবেষণা সহযোগিতা :

এনসিইপিইউ বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প-গবেষণা সহযোগিতার উপর জোর দেয়, প্রায় ১০০টি অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশী জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করে। বিশ্ববিদ্যালয়টি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যের অন্বেষণ ও শিল্পায়নে অবদান রেখেছে। এনসিইপিইউ সক্রিয়ভাবে ইন্টারস্কলাস্টিক সহযোগিতার প্রচার করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে রিসোর্স ভাগাভাগি এবং সহযোগিতামূলক উদ্ভাবনের জন্য জোট স্থাপনে একটি প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করছে।

আন্তর্জাতিকীকরণ এবং বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ :

এনসিইপিইউ (NCEPU) প্রায় ১৪০টি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিষ্ঠিত অংশীদারিত্ব সহ আন্তর্জাতিক শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত রয়েছে। জার্মানি এবং মঙ্গোলিয়ার সাথে উদ্ভাবন কেন্দ্র স্থাপন করে বিশ্ববিদ্যালয়টি বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ-এ অংশগ্রহণ করেছে। এটি সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন ইউনিভার্সিটির জ্বালানি বিজ্ঞান বিভাগে নেতৃস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেও কাজ করে।

একাডেমিক অর্জন এবং স্বীকৃতি :

এনসিইপিইউ একাডেমিক ক্ষেত্রে একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ধারণ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল ডিসিপ্লিন অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী, এনসিইপিইউ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের জন্য এ প্লাস (A+) র‍্যাঙ্কিং ধারী শুধুমাত্র তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি, এবং উল্লেখযোগ্যভাবে, এটিই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেটি প্রতিষ্ঠার দিন থেকে অদ্যাবধি তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের উপর অনন্য গুরুত্ব আরোপ করে গেছে।

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের পাঠদান :

১৯৮৫সালে ভিয়েতনামের ছাত্র ভর্তির মাধ্যমে শুরু হওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের পাঠদানের একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে এনসিইপিইউ (NCEPU)-এর। বর্তমানে, প্রায় ৫০টি দেশের ১০০০-এরও বেশি শিক্ষার্থী এনসিইপিইউ (NCEPU)-তে অধ্যয়ন করছে । বিশ্ববিদ্যালয়টি স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি-তে ইংরেজি মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করে থাকে । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো- ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং রিনিউয়েবল এনার্জি।

সহশিক্ষা মূলক কার্যক্রম :

এনসিইপিইউ শুধুমাত্র একাডেমিক সাধনায় নয় বরং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপেও পারদর্শী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া দলগুলি সামগ্রিক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে।

হুয়াডিয়ান জনগণ হওয়ার গর্ব :

এনসিইপিইউ-এর একজন ছাত্র হিসেবে, আমরা গর্বিতভাবে নিজেদেরকে "হুয়াডিয়ান মানুষ (华电人)" বলে পরিচয় দিয়ে থাকি । এই শব্দটি শিক্ষা, উদ্ভাবন এবং শ্রেষ্ঠত্বকে মূল্য দেয় এমন একটি সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত আমাদের সামগ্রিক অনুভূতিকে প্রতিফলিত করে। এটা শুধু শেখার জায়গা নয়; এটা আবেগ এবং গর্বের বিষয়।

পরিশেষে, নর্থ চায়না ইলেকট্রিক পাওয়ার ইউনিভার্সিটি একাডেমিক উৎকর্ষ এবং উদ্ভাবনের আলোকবর্তিকা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, যা চীন এবং তার বাইরেও জ্বালানি ও বিদ্যুৎ শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে । একজন ছাত্র হিসাবে আমি এই মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশ হতে পেরে সম্মানিত এবং এনসিইপিইউ (NCEPU)-এর এমন চলমান অগ্রগতি এবং কৃতিত্বের উত্তরসূরী হওয়ার জন্য আমি গর্বিত ।

মোঃ সাঈদ পারভেজ

তড়িৎ প্রকৌশল ও স্বয়ংক্রিয়করণ বিদ্যা বিভাগ, নর্থ চায়না ইলেকট্রিক পাওয়ার ইউনিভার্সিটি. বেইজিং. চীন।

Memories of Friendship and Learning

In the tapestry of life, memories are the threads that bind our experiences into a beautiful tapestry. My journey at Tongji Medical College is a prominent part of Huazhong University of Science and Technology (HUST), a university renowned for its academic excellence, medical education, and research, which was a tapestry woven with the colors of friendship and learning.

During my time at HUST, I had the opportunity to meet a group of foreign friends who shared a similar passion for knowledge. Our diverse backgrounds and cultural differences were the threads of unity in our friendship. We bonded over shared interests, late-night discussions, and countless hours spent in the library.

One of the most profound memories I have is of our study sessions. We sat together, comparing notes, explaining complex clinical concepts to one another, and offering different perspectives on subjects. These sessions were not just about learning; they were about understanding each other's viewpoints and growing together.

Our weekend outings were filled with laughter, music, and shared stories. We visited local attractions, tried local cuisine, and experienced the rich culture of our host country. These experiences broadened our horizons and strengthened our friendships.

The HUST community was like a big family. We supported each other through highs and lows, celebrated successes together, and comforted each other during challenging times. Our foreign friends taught us about their cultures, traditions, and ways of life. In turn, we

introduced them to the beauty of our own culture.

International cultural exchanges also marked my time at HUST. We organized festivals and exhibitions showcasing our respective countries' diverse cultures. These events brought together people from different backgrounds and allowed us to appreciate the richness of global diversity. Moreover, our interactions were not limited to the classroom or campus. We often gathered at each other's dormitory rooms for impromptu gatherings, sharing delicious home-cooked meals and exchanging stories about our daily lives. These gatherings deepened our friendships and created lasting memories.

Looking back, my time at HUST was a cherished chapter. It was a time filled with laughter, learning, and growth. My foreign friends were not just classmates; they were brothers and sisters in knowledge. The memories we share are the true treasures of my academic journey. In addition, the friendships I forged at HUST have lasted well beyond graduation. We have remained in touch through social media, email, and occasional visits. Our shared experiences have created a bond that cannot be broken, even by distance or time.

In conclusion, my time at HUST was a unique and transformative experience. It was not just about earning a degree; it was about building lifelong friendships and learning about different cultures and perspectives. The memories I have created there are irreplaceable and will forever be a part of my life's tapestry.

Dr. K M SUSMI

Master's,

Southern Medical University, Guangzhou, China.

China in My Eyes

Since my school days, I have felt a special interest in the Chinese language and culture. Chinese cuisine and karate were also two of my main points of interest. After completing my graduation, my desire to study in China became intense. And by winning one of the most prestigious Chinese government scholarships (Type-A), my long-cherished dream came true. On October 26, 2022, I started my journey to China on a China Southern Airlines flight at 11:30 p.m. My destination was Guangzhou. After completing a ten-day quarantine in Guangzhou, I arrived in Xi'an. That's how I started my life in China.

China is undoubtedly one of the leading countries for quality education. Chinese university labs in particular are of high quality and China has set a milestone in the world in terms of research. China has numerous world-class universities including Tsinghua, Peking, and Fudan.

China has the second-largest economy in the world. China is an export-dependent country. In the last 50 years, there has been a radical change in China's economic context. Almost all products in the world are produced in China. China's large economy and free trade policy have encouraged businessmen from all over the world to trade and invest in China.

China's success in science and technology is enviable. The use of technology in every field in China is noticeable and obvious. By giving importance to science and technology practice and research, China has become a technology-dependent country in today's world. The touch of technology can be seen in all areas including banking, the education system, government and private offices, roads, trade, and commerce.

China is one of the most important countries in the world in terms of security. Closed circuit cameras and sophisticated security systems are everywhere in China. In addition, strict punitive measures are taken in case of violation of safety laws. Maximum security is ensured in every public and private institution, shopping mall, and public place in China. And so, China has become one of the favorite places for foreigners.

China has become the center of business for the whole world. China not only exports goods, but also provides all the raw materials for making goods, and there are good job opportunities for foreigners in China. Being an export-dependent country, China has developed numerous world-class industrial establishments employing skilled workers. People who are proficient in the Chinese Language have a higher chance of getting a job.

China's strategy in infrastructure construction is particularly noteworthy. Chinese engineers are very good at building any infrastructure in a very short

time. Chinese engineers are very adept at not only executing the construction works in the fastest time but also bringing a touch of innovation to these infrastructures.

China is a land of ancient civilizations, diverse landscapes, and vibrant culture, which beckons travelers with a kaleidoscope of experience. From the majestic Great Wall winding through rugged mountains to the serene beauty of Yangshuo's Karst formations, every corner promises a unique wonder. Some of China's most captivating tourist spots are The Great Wall of China, The Forbidden City, the Terracotta Army, the Li River Cruise, Giant Pandas, West Lake, the Bund, etc.

Finally, it can be said that China is a wonder of the modern world. China has shown its superiority to the world by making rapid progress in various fields including science, education, economy, infrastructure, and research. China is a friendly country of Bangladesh and one of the main partners in various development activities. I hope that China's cooperation in the development activities of Bangladesh will continue in the future.

Md Intekhab Rahman Galib

MBA, Xi'an Jiaotong University, Xian, China.

Research & Development Secretary, BCYSA.

চীনে ভ্রমণ : এক স্বপ্নের সাক্ষাৎ

এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ার পর হঠাৎ ভুত চাপলো মাথায় দেশে না পড়ে বাহিরে ব্যাচেলর শেষ করার। কিন্তু এত অল্প সময়ে কিভাবে শুরু করি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ এক বড় ভাইয়ের ফেসবুকে পোস্ট থেকে চীনের বিষয়ে জানা। এরপর দিন রাত এক করে যখন দেখলাম,চায়নার অগ্রসর এরপরেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত যে চায়না তেই যাবো।এরপর সেই বড় ভাইয়ের সাথে কথা বলে সব ঠিকঠাক করে অপেক্ষার শুরু কোন ইউনিভার্সিটি আমার ভাগ্যে আছে তাই নিয়ে। অবশ্য আমি বিবাহিত ছিলাম আমার বউ এবং আমি দু'জনেই কি একই ইউনিভার্সিটি তে ভর্তি হতে পারবো সেটাও ছিল একটা চিন্তার বিষয়। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আমরা দু'জন একত্রে ইয়াংঝু ইউনিভার্সিটি তে চান্স পাই। আমার স্বপ্নের সাব্জেক্ট ম্যাকানিকাল এই আমার হয়। এরপর প্রথম বছরের দু'টি সেমিস্টার অনলাইনে শেষ করা হয় করোনার কারণে চায়নার বর্ডার খোলা হয়নি তাই। অতপর একদিন নোটিস এলো আমরা এবার যেতে পারবো কারণ বর্ডার খুলে দিয়েছে, ফ্লাইট চালু হয়েছে। অতপর আমাদের যাওয়ার পালা। দেশ ছেড়ে বাবা মা কে ছেড়ে আমার এই প্রথম কোথাও যাওয়া। ১১ মে আমি এবং আমার ওয়াইফ ৩.৪০ মিনিটের ইস্টার্ন এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইটে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে

রওনা করি। বিরতি পরে কুনমিং এ। প্লেন থেকে নেমেই শুরু হয় ভাষার কারণে নানান সমস্যা। একটি কানাডিয়ান দম্পতি পেয়েছিলাম যারা চীনা ভাষা পারে।তারা আমাদের শেষ পর্যন্ত সাহায্য করে যার কারণে ১ ঘন্টার ট্রানজিট পর সময়মত ন্যাঞ্জিং এত উদ্দ্যেশ্যের প্লেনে উঠতে পারি।

রাত ১ টায় নেমে পরি ন্যাঞ্জিং এ। সেখান থেকে সকল ব্যাগেজ নিয়ে বের হই কারণ বাহিরেই অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য ট্যাক্সি। এখানে সিম ছাড়া ওয়াইফাই ও চলছিল না। তাই পরিবারের কাউকে জানাতেও পারিনাই পৌছেছি কিনা। এরপর একজন পুলিশ আমাদের তার ফোনের হটস্পট দেয়ায় আমরা জানাতে পারি। ন্যাঞ্জিং থেকে ৪ টায় এসে প্রচন্ড ঠান্ডায় যখন নিজের ইউনভার্সিটি তে পৌছাই তখন এক বড় ভাই এসে নিয়ে রুম ঠিক করে দেয়। এরপর সামান্য রেস্ট নিয়ে পরদিন চলে যাই সিম কিনে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে। খাবার নিয়ে প্রচুর কষ্ট হয়েছে কারণ বাহিরে খেতে পারতাম না আর নিজেরা রান্না করতে পারতাম না।পরে আস্তে আস্তে শিখে ফেলি। অনেক বাধা পেয়েছি কিন্তু সব ঠিকঠাক অতিক্রম ও করেছি কারণ এখানের মানুষ যেমন অমায়িক তেমন সাহায্য করতেও কোনো দ্বিধা বোধ করে নাই।

রাফিদ মুস্তাভি

স্নাতক,

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং,

ইয়াংজু বিশ্ববিদ্যালয়, ইয়াংজু, চীন।

প্রচেষ্টা ও প্রাপ্তি : আত্মকথা

“এক অচেনা "চীনের " বাস্তব গল্প অবলম্বনে”

আমার শৈশবের খসখসে শরতের বাতাসে, আমি

বাতাসের বিরুদ্ধে দৌড়াতাম, অধরা স্বপ্ন আর ঝরে পড়া পাতার কোলাহলে তাড়া করতাম। আমি খুব কমই জানতাম যে সেই প্রথম পায়ের ছাপগুলি আমার জীবনের ক্যানভাসে একটি অমোঘ চিহ্ন রেখে যাবে।

ঘূর্ণায়মান নদী এবং অন্তহীন মাঠের মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট গ্রামে আমার জন্ম।

যেখানে ফসল ও ধানের গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়ায়, এটি এমন একটি জায়গা যেখান থেকে ধীরে ধীরে--- আমি রিপন রায়, ডোমার, নীলফামারী।

সুদূর চীনে আসার গল্প

সাল ২০১৬! ব্যাচেলর ডিগ্রি সম্পন্ন করে, সেশনজট যন্ত্রণার কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ২০১৬ সালে পরিকল্পনা করলাম চীনে আসার।

২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর ইনটেকে চাইনীজ গভারমেন্ট স্কলারশিপের অধীনে ছংচিং ইউনিভার্সিটি অফ পোস্ট অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনের ম্যানেজমেন্ট সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং মেজরে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিলাম।

বিমান থেকে চীনের মাটিতে নামার সময় ধূপের গন্ধ বাতাসে ভেসে উঠল। আমি খুব কমই জানতাম যে , এই আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ কাজটি একটি রূপান্তরমূলক যাত্রার সূচনা করবে — একটি প্রাণবন্ত সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে অবস্থান এবং একটি দেশ যেখানে প্রতিটি রাস্তার কোণে প্রাচীন জ্ঞানের গল্পগুলি ফিসফিস করে।

প্রথমবার যখন আমি ছংচিং -এ পা রাখি, তখন শহরটি আমাকে আলিঙ্গন করে আওয়াজ এবং রঙের ঘূর্ণিঝড় দিয়ে। পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত এবং ইয়াংজি নদীর পাড়ে, ছংচিং সাহসিক কাজ এবং সাংস্কৃতিক নিমজ্জনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইশারা করেছিল।

প্রাচীন দাজু রক খোদাই অন্বেষণ থেকে শুরু করে ইয়াংজি বরাবর প্রাণবন্ত ড্রাগন বোট ফেস্টিভ্যাল উদযাপন, প্রতিটি সাংস্কৃতিক সাক্ষাৎ আমার চংকিং গল্পের একটি অধ্যায় হয়ে উঠেছে। শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়, আমার নিজের হয়ে গেল ।

চপস্টিক ব্যবহার করার শিল্প আয়ত্ত করা থেকে শুরু করে স্থানীয় রীতিনীতির জটিলতাগুলি আয়ত্ত করা পর্যন্ত চ্যালেঞ্জগুলি আনন্দের ছিল । তবুও, প্রতিটি বাধার সাথে, আমি নিজের মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা আবিষ্কার করেছি। শহরের খাড়া পাহাড়গুলি আমার নিজের আরোহণের প্রতিচ্ছবি করেছে এবং আমার যাত্রা শেষে, আমি উভয়ই জয় করেছি। চীনের মাটিতে ৩০০ এর বেশি বিদেশিদের কে নিয়ে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের বিজয় দিবসের উদযাপনের অভিজ্ঞতা।

চীন ভ্রমণ, মহামারী কোভিড-১৯ এবং জীবন সংগ্রাম

লেখাপড়ার পাশাপাশি একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে খন্ডকালীন চাকরি করার সময় ভ্রমণ করার শখ নিজের অজান্তে জাগ্রত হয়েছিল। চীনের বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল - যেমন গুয়াংঝু, সেনইয়াং টিয়েনজিন কুইযহ

কুনমিং ও বেইজিং ইত্যাদি।

মহামারী কোভিড-১৯ সময়কালে চীনের অবস্থানরত সকল বিদেশি যখন মাতৃভূমি ও পরিবারে ফেরার আকুলতায় ব্যস্ত ঠিক তখন আমি ব্যস্ত সময় কাটিয়েছি নির্দিষ্ট সময় মাস্টার্স সম্পন্ন করার অভিপ্রায় নিয়ে। মহামারীর সময়ে পরিবারের সাথে ভার্চুয়ালি প্রচুর সময় ব্যয় করা হয়েছিল। অবশেষে ২০২০ সালের নির্দিষ্ট সম আমি মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করি।

ট্রাভেল এজেন্সিতে পার্টটাইম করার সুবাদে ট্রাভেল এজেন্সিতে ফুল টাইম জব করার সুযোগ পেয়েছিলাম কিন্তু ভিসা জটিলতার কারণে বাংলাদেশে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম ২০২০ সালের আগস্ট মাসে।

এরই মধ্যে ২০২১ সালে ১৫ই ফেব্রুয়ারি মাসের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সুসম্পন্ন হলো- বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। জীবনে যুক্ত হলো সহযোদ্ধা। লেখাপড়া ও চাকরির সুবাদে এসে-বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর জন্য কখনো সহধর্মিনী পাশে ছিল আবার কখনো নয়। এই নিয়ে বিন্দুমাত্র অভিমান পরিলক্ষিত হয়নি সহধর্মিনীর মাঝে।

ফিরে আসার গল্প

সুপরিচিত কয়েকজন বিদেশি বন্ধু ছিল যারা ইউনিভার্সিটি অফ চাইনিজ একাডেমি অফ সাইন্স এর পিএইচডি তে অধ্যায়নরত ছিল তাদের সাথে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় । নতুন ইচ্ছার জন্ম নিল পিএইচডি করতে হলে এই বিশ্ববিদ্যালয় করতে হবে। সেই থেকে ইউনিভার্সিটি অফ চাইনিজ একাডেমি অফ সাইন্সে পিএইচডি করার একটা সুপ্ত বাসনা জন্ম নিয়েছিল।

শুরু হলো নতুন সংগ্রাম নিজেকে নতুন করে চাইনিজ একাডেমি অফ সাইন্স (CAS)এর অন্তর্ভুক্ত স্বনামধন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডিতে ভর্তি হওয়ার জন্য নিজেকে গড়ে তোলা।

সৃষ্টিকর্তার কৃপায় এবং নিজের প্রচেষ্টায় ভারতের চন্ডিগড় বিশ্ববিদ্যালয় টিচিং ইন্সট্রাক্টর হিসেবে যোগদান করার সুযোগ । যা আমার জীবনে সম্পূরক সুযোগ হয়ে এসেছিল । (মার্চ ২০২১ - এপ্রিল ২০২৩)

শিক্ষকতার পাশাপাশি নিজেকে গবেষণাধর্মী কাজ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করলাম। ভারতসহ বিভিন্ন দেশের ৫০ এর বেশি কনফারেন্স ও রিসার্চ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করার সুযোগ। উল্লেখিত ছিল মার্কেটিং এর জনক ফ্লিপ কটলারের রিসার্চ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ। সেই সাথে গবেষণা পত্র জার্নালে প্রকাশ করা সহ বেশ কিছু জানালে এডিটর হিসেবে কাজ করা।

এরপর এলো বহু প্রতিক্ষিত ইউনিভার্সিটি অফ চাইনিজ একাডেমী অফ সাইন্স এর ২০২৩ সালের ANSO স্কলারশিপের সার্কুলার ।সৃষ্টিকর্তার কৃপায় সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয় স্কলারশিপ এর অধীনে পিএইচডি করার সুযোগ।

পুরো প্রক্রিয়া যারা ইতিবাচকভাবে পাশে ছিল, সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে প্রিয় পারিবারের সদস্য এবং ভারত ও চীনে অবস্থিত শুভাকাঙ্ক্ষীগণ।

আমি এবং আমার গল্পের সমীকরণ হলো—

প্রচেষ্টা + ভাগ্য= প্রাপ্তি

রিপন রায়
পিএইচডি ইন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট
স্কুল অফ ইকনোমিকস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট
ইউনিভার্সিটি অফ চাইনিজ একাডেমী অফ সাইন্স, বেইজিং, চীন।

দ্বিভাষিক মুহূর্ত : বাংলা ও চীনায় প্রথম দিন

আমি ২০২২ এর ইন্টান্যাশনার বিজনেস এর স্টুডেন্ট। চায়না আসা ২০২৩ এর মে মাসে।করোনার কারণে অনলাইনে প্রায় দুই সেমিস্টার পড়া হয়। এরপর চায়না তে এসেই দু মাসের একটা ভ্যাকেশন পার করা হয়। আগে কখনোই ঘরে রান্নাবান্না করা হয়নাই তাই এই ভ্যাকেশনে রান্না করতে করতে রান্না টাও হাতের আওতায় চলে আসে। ভাষা গত সমস্যা থাকার কারণে প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে যাওয়া হতো না। সেপ্টেম্বর এ ৩য় সেমিস্টারের ক্লাস শুরু।

হঠাৎ একদিন ডিপার্টমেন্ট এর একজন এর সাথে মুন কেক ফেস্টিভ্যাল এ যাওয়া হয়,যেটা ম্যাকানিকাল ডিপার্টমেন্ট এই শুধু উদযাপিত হচ্ছিল। সেখানে যেয়ে আমার প্রথম চাইনিজ বন্ধু স্যালির সাথে পরিচয়। সে ফুড সাইন্স নিয়ে পরে। মুন কেকে তাকে কেক বানিয়ে দেখানোর জন্য আনানো হয়েছিল। কথা বলতে বলতে তার সাথে বন্ধুত্ব হয়। তার কিছুদিন পরেই আমার বার্থডে ছিল সে আমার আরেক ফ্রেন্ড থেকে শুনেছে।এরপর আমাকে না জানিয়ে আমার সাথে দেখা করতে এসেছে গিফ্টস নিয়ে।সেখানে একটি বার্থডে কার্ড ছিল। যেটা আমার চিন্তার বাহিরে ছিল। কার্ড টা খুলেই দেখু সেখা বাংলাতে আমাকে সে শুভ জন্মদিন লিখে দিয়েছে,সেটা আমাকে অনেক আবেগী করে তুলেছিল।আমি তার সাথে আমার প্রথম দিনের পরিচয় এর ছবি এবং তার দেয়া উপহার এর ছবি সংযুক্ত করলাম

ইবনাত এস এম নুহিন

স্নাতক, আন্তর্জাতিক ব্যবসা

ইয়াংজু বিশ্ববিদ্যালয়, ইয়াংজু, চীন।

China's AI Ascent: Navigating the Global Frontier

In the ever-evolving landscape of artificial intelligence (AI), one nation is making waves and setting its sights on global leadership. China's strategic roadmap for AI dominance unfolds as a narrative of ambition, innovation, and collaboration. This report delves into the proposed milestones that underscore China's journey to the forefront of AI research and development.

Phase I: Foundation Building (2017-2020):

As the curtains rose on China's AI ambitions, the initial phase was dedicated to establishing a robust foundation. Substantial investments poured into research institutions, fostering a dynamic collaboration between academia and industry. The emphasis on talent acquisition aimed to attract and cultivate the brightest minds in AI research, laying the groundwork for what was to come. In 2018, Microsoft announced the establishment of Microsoft Research Asia-Shanghai and the Microsoft-INESA AI Innovation Center at the Shanghai Xuhui District, bringing world-class artificial intelligence (AI) research capabilities to the city. This was the time we saw a surge in research papers from researchers in China. During this time the Google of China (Baidu) released “xiao yu” or little fish. Which is capable of competing with Amazon’s Alexa and Apple’s Siri. Around the same time Microsoft Asia also released Xiaoice (Chinese: 微软小冰; pinyin: Wēiruǎn Xiǎobīng; developed by Microsoft (Asia) Software Technology Center (STCA) in 2014 based on an emotional computing framework that was designed as a mental support chatbot.

Phase II: Research Dominance (2021-2023): With the foundation firmly in place, China entered a phase of unparalleled research dominance. The

nation set its sights on surpassing global.

competitors in the sheer volume and impact of AI research publications. Increased funding and interdisciplinary collaboration became the cornerstones, propelling China to the forefront of AI research, with specific targets in mind for high-impact publications and citations.

In 2017, China unveiled the "New Generation AI Development Plan," articulating its ambition to lead the global AI race by 2030. Emphasizing natural language processing, computer vision, and smart robots, the plan set the stage for China's ascent in AI.

The subsequent year witnessed a massive influx of investment, with over $10 billion poured into AI startups by venture capital firms. This financial boost catalyzed the growth of prominent Chinese AI companies like SenseTime, Megvii, and YITU Technology.

By 2022, the Chinese government announced plans for an "AI Innovation Center" in Shanghai, slated for completion in 2025. The center's focus on smart cities, healthcare, and finance underscored China's commitment to practical applications of AI on a grand scale.

In 2023, the spotlight shifted to autonomous vehicles. Companies such as Baidu, Geely, and NIO began testing and deploying autonomous vehicles on public roads, signaling China's strides toward the commercialization of autonomous transportation. Simultaneously, China made substantial progress in AI-powered healthcare technologies. Industry giants Alibaba, Tencent, and iKang Healthcare pioneered AI-powered diagnostic tools and medical imaging technologies, promising to elevate the accuracy and efficiency of healthcare services in the country.

Acknowledging the ethical dimensions of AI, China's government declared plans

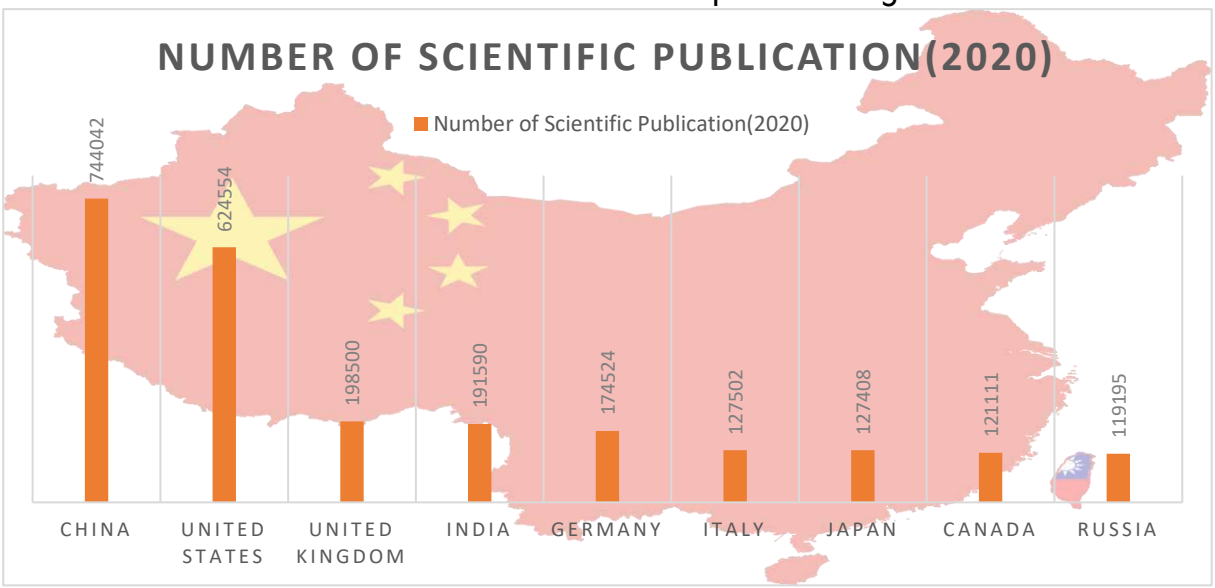

for an "AI Ethics Committee" in 2023, expected to be established in 2024. This committee aims to ensure responsible and ethical development and usage of AI technologies, aligning with China's commitment to ethical AI practices

Phase III: Technological Innovation (2024-2027):

The narrative then shifted towards translating research into tangible applications, driving technological innovation. AI startups and incubators became focal points for investment, accelerating the development of cutting-edge technologies. China aimed to lead in areas such as natural language processing, computer vision, and autonomous systems, solidifying its position as a technological powerhouse.

Phase IV: Global Collaboration (2028-2030):

Acknowledging the importance of a global perspective, China actively pursued collaboration on the international stage. Partnerships with renowned research institutions, joint projects, and knowledge exchange initiatives became the norm. The nation aspired to not only lead in AI but to foster a global community, setting the stage for collaborative advancements in AI research.

Phase V: AI Integration in Society (2031 Onward):

The final act in China's AI saga involves the seamless integration of AI into the fabric of society. The focus shifts to practical applications, with AI-driven solutions permeating sectors like healthcare, education, finance, and smart cities. The emphasis on responsible and ethical AI development underscores China's commitment to shaping not just technology but its societal impact.

China's proposed milestones in the realm of AI are not merely markers of technological prowess but a testament to a holistic vision for the future. As the nation navigates through these phases, it is not just ascending the ranks in technological innovation; it is pioneering a new era in AI—one where collaboration, innovation, and responsibility intersect on the global stage. Watch closely as China continues to shape the narrative of AI, defining the course for the rest of the world to follow.

Abu Bakor Hayat Arnob

Masters,

Nanjing University of Information Science and Technology

Nanjing, China.

চীনে শিক্ষা, গবেষণা, এবং প্রযুক্তির অগ্রগতি

একটি উন্নত এবং ঐতিহাসিক দেশ হিসেবে পরিচিত চীন। দেশটি শিক্ষা, গবেষণা, এবং প্রযুক্তির আলোকে এক নতুন অধ্যায় রচছে। এই প্রবল উন্নতির ভীড়ে, চীন নিজেকে একটি আধুনিক সমাজের অগ্রগতির মাধ্যমে অভিজ্ঞ করাচ্ছে, এবং তথ্যপ্রযুক্তির আবেগে নিজেকে আত্ম-প্রকাশ, একে অপরকে অনুকরণ করা এবং উৎসাহিত করা হচ্ছে, যা শিক্ষার উদাহরণ কে একটি শক্তিশালী উদাহরণে রূপান্তর করে। এছাড়াও, বিভিন্ন শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে চীন সরকার এবং বিভিন্ন স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থা বাচ্চাদের শিক্ষা উন্নত করতে নতুন এবং আধুনিক পদক্ষেপ নেয়। শিক্ষার প্রক্রিয়ায় তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) সংস্করণ হয়েছে, যা ছাত্রদের জন্য একটি দক্ষ এবং মৌলিক শিক্ষামূলক পরিবেশ তৈরি করে। ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, ইন্টার‍্যাক্টিভ শেখার সরঞ্জাম, এবং অনলাইন সহায়ক উপাদান হয়ে উঠেছে শিক্ষার প্রক্রিয়া, যা ছাত্রদেরকে একটি প্রস্তুত এবং মজুত শেখার পরিবেশ সরবরাহ করে।

প্রযুক্তিতে বৃদ্ধি করার সাথে সাথে চীনের উচ্চ শিক্ষার স্তরে ছাত্রবৃন্দ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে আসছে। বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, এবং সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠভূমি থেকে আসা এই ছাত্রদের জন্য চীনের বিশ্ববিদ্যালয় একটি আকর্ষণীয় শিক্ষা দেয়।

চমৎকার গবেষণা এবং নবতন্ত্র প্রযুক্তির চীন একটি সক্ষম ও উন্নত গবেষণা, প্রযুক্তি সাক্ষরতা দেশ। যে দেশটি পৃথিবীতে একটি প্রযুক্তিগত উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এবং যেখানে নবতন্ত্র প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্ভাবন হচ্ছে। চীন আধুনিক প্রযুক্তি এবং উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষণা একটি সক্ষম এবং উদ্ভাবনী শক্তি। চীনের শিক্ষা পথটি একটি অদ্ভুত যাত্রা, যেখানে শিক্ষার উদাহরণকে একটি অতুলনীয় স্থানে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। দেশটি যেখানে বাচ্চাদের শিক্ষার সাথে একটি চমৎকার

গতি এবং প্রযোজনীয় সংগঠন তৈরির লক্ষ্যে একত্রে কাজ করছে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিজ্ঞান এবং গণিতের মধ্যে পূর্বগতি হতে একটি অদ্ভুত সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। চীনের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহত্তর মানের শিক্ষা প্রদান করছে এবং প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে

বিশেষজ্ঞতা অর্জন করতে প্রবৃদ্ধি করছে। এছাড়াও, উন্নত শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য প্রযুক্তিগত সাধারণকে মোকাবেলা করতে এবং বৃহত্তর বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির চুক্তি করতে একটি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। চীনের এই প্রয়াসের মাধ্যমে একটি উত্তরাধীন, সৃজনশীল এবং সক্ষম সমাজ উৎপন্ন হচ্ছে, যা শিক্ষা এবং তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিজেকে পৃথিবীর অগ্রগতির সাথে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম। চীনের শিক্ষা পথের এই অদম্য সাফল্যের পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এখানে শিক্ষকবৃন্দ সক্ষমভাবে তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম তৈরি করতে সক্ষম। এটি বাচ্চাদের উদ্দীপনার প্রবৃদ্ধি করে এবং তাদেরকে শিক্ষায় আগ্রহী করে।

সবশেষে, চীনের শিক্ষা, গবেষণা, প্রযুক্তির অসাধারণ যাত্রা যা দেশটিকে করে তুলেছে বৈশ্বিক পর্যায়ে একটি অগ্রগতি এবং উন্নত শক্তি হিসেবে এবং এটি একটি নতুন ধারাবাহিক বলা যেতে পারে। চীনের শিক্ষা ও গবেষণা সিস্টেম প্রবৃদ্ধি করতে এবং পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির মধ্যে অগ্রগতি করতে একটি উদাহরণ স্থান হিসেবে উঠে আসছে।

সোনিয়া আক্তার

স্কুল অফ এনার্জি পাওয়ার এন্ড মেকানিকাল,
নর্থ চায়না ইলেকট্রিক পাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, বেইজিং, চীন।

কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং এআই : প্রযুক্তির ভবিষ্যত

প্রযুক্তির দ্রুত বিকশিত ল্যান্ডস্কেপে, দুটি অগ্রগামী শক্তি—কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-আমাদের যুগান্তকারী অগ্রগতির যুগের দিকে চালিত করছে। এই বৈপ্লবিক প্রযুক্তিগুলি, বায়োকেমিক্যাল সিমুলেশন থেকে ডেটা এনক্রিপশন, আর্থিক মডেলিং এবং এর বাইরেও বিভিন্ন ডোমেনকে অন্তর্ভুক্ত করে, আমাদের প্রযুক্তিগত ভবিষ্যতকে সম্পূর্ণরূপে পুনঃসংজ্ঞায়িত করতে প্রস্তুত। আমরা যখন গবেষণা এবং উন্নয়নের এই অভূতপূর্ব ত্বরণের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং এআই-এর সমন্বয়সাধন একটি রূপান্তরমূলক যুগের কথা বলে যা আমাদের বিশ্বকে অকল্পনীয় উপায়ে নতুন আকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উপর ভিত্তি করে, ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারের বাইনারি সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে। কোয়ান্টাম কম্পিউটারগুলি কোয়ান্টাম বিট বা কিউবিট ব্যবহার করে, যা সুপারপজিশনের কারণে একই সাথে 0 এবং 1 উভয়কেই উপস্থাপন করতে পারে। এটি একাধিক কম্পিউটেশনাল পাথওয়েগুলিকে একসাথে অন্বেষণ করার অনুমতি দেয়, জটিল সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য নতুন পথ খোলার জন্য। যেহেতু আমরা কিউবিটের সংখ্যা বাড়াই, কোয়ান্টাম কম্পিউটারের গণনা শক্তি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। Google-এর Sycamore প্রসেসর সম্প্রতি 200 সেকেন্ডে একটি জটিল সমস্যা সমাধান করে একটি কোয়ান্টাম শ্রেষ্ঠত্বের

মাইলফলক অর্জন করেছে যা বিশ্বের দ্রুততম সুপার কম্পিউটারকে 10,000 বছর নিতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে শেখার শুরু:

AI মানুষের বুদ্ধিমত্তার অনুকরণ করে এমন মেশিন এবং সিস্টেম তৈরি করে আমাদের বিশ্বে বিপ্লব ঘটাচ্ছে। যাইহোক, আমাদের ডেটার ক্রমবর্ধমান জটিলতা এবং ভলিউম আমাদের কম্পিউটিং ক্ষমতার জন্য উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে। কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ডেটা প্রসেসিং ত্বরান্বিত করে AI বিপ্লব ঘটাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, 175 বিলিয়ন প্যারামিটার সহ OpenAI-এর GPT-3-এর মতো AI

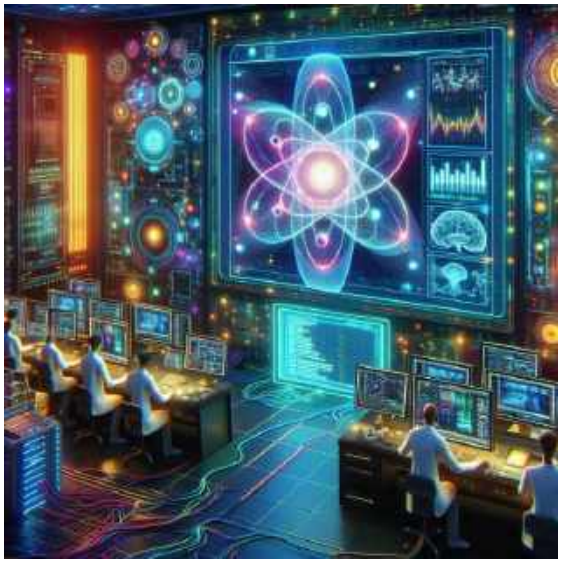

মডেলগুলিকে প্রশিক্ষণ দিতে কয়েক মাস সময় লাগতে পারে, এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী ক্লাউড-ভিত্তিক সুপারকম্পিউটার 4. উন্নত AI অ্যালগরিদমগুলির সাথে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-এর বিপুল কম্পিউটেশনাল শক্তি একত্রিত করা জটিল AI চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করতে সাহায্য করতে পারে। যেগুলো বর্তমানে ক্লাসিক্যাল কম্পিউটিং এর ধরাছোঁয়ার বাইরে।

কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং এআই-এর মধ্যে সমন্বয়

কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং এআই এর মধ্যে বাধ্যতামূলক সমন্বয় প্রযুক্তিগত উল্লম্ফনের জন্য একটি অভূতপূর্ব সুযোগ উপস্থাপন করে। কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর ব্যতিক্রমী গতি এবং শক্তি এআই সিস্টেমের শেখার বক্ররেখাকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং তাদের নির্ভুলতা বাড়াতে পারে। ভবিষ্যদ্বাণীর ফলাফল যাচাই করার জন্য কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের ক্ষমতা এবং শব্দ কমানোর মাধ্যমে ত্রুটির ঘটনা কমিয়ে আনতে AI অ্যালগরিদম 5-এর কার্যকারিতা আরও বাড়িয়ে তোলে। একটি বিশেষভাবে প্রতিশ্রুতিশীল ক্ষেত্র হল নিউরাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (NLP)। কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, তার অতুলনীয় প্রক্রিয়াকরণ শক্তির সাথে, ভাষায় বহুমুখী ভেরিয়েবলকে ডিকোড করার ক্ষমতা রাখে, এমন একটি কাজ যা এআই মডেলের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে চলেছে। প্রাকৃতিক ভাষা বোঝা এবং প্রজন্ম হল জটিল কাজ যার জন্য জটিল ভাষাগত কাঠামো, প্রাসঙ্গিক সংকেত এবং শব্দার্থগত সূক্ষ্মতার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ঐতিহ্যগত এআই মডেলগুলি এনএলপি-তে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে, কিন্তু তারা প্রায়শই গণনাগত ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে এবং মানুষের নিজের মতো গভীরতা এবং নির্ভুলতার সাথে মানুষের ভাষার জটিলতাগুলি বোঝার জন্য সংগ্রাম করে। NLP কাজের জন্য ডিজাইন করা কোয়ান্টাম অ্যালগরিদমগুলি ভাষা মডেলগুলির প্রশিক্ষণকে ত্বরান্বিত করতে পারে,

ভাষা অনুবাদ এবং অনুভূতি বিশ্লেষণ উন্নত করতে পারে এবং পাঠ্য ডেটা 7 এর সামগ্রিক বোঝার উন্নতি করতে পারে। অধিকন্তু, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং এআই-এর বিয়ে এনএলপির (NLP) বাইরেও প্রসারিত। কোয়ান্টাম-অনুপ্রাণিত মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমগুলি অপ্টিমাইজেশান সমস্যা যেমন রিসোর্স বরাদ্দ, রুট অপ্টিমাইজেশান এবং সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের সমাধানে প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছে। কিউবিটগুলির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে, এই অ্যালগরিদমগুলি একযোগে বিপুল সংখ্যক সম্ভাব্য সমাধানগুলি অন্বেষণ করে এবং মূল্যায়ন করে, জটিল অপ্টিমাইজেশান চ্যালেঞ্জগুলির জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রদান করে যা বিভিন্ন শিল্পকে জোরালো করে।

কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং এআই বিপ্লবে বিশ্ব:

এই কোয়ান্টাম-এআই নেক্সাসের অসামান্য সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়ে, অসংখ্য টেক বেহেমথ এবং ইনভেস্টমেন্ট জুগারনট এই রূপান্তরকারী প্রযুক্তির বিকাশে ইন্ধন জোগাচ্ছে। মাইক্রোসফ্ট, গুগল, আলিবাবা এবং টেনসেন্টের মতো টাইটানগুলি কোয়ান্টাম ফ্রন্টিয়ার 8 এর দিকে চার্জের নেতৃত্ব দিচ্ছে, যখন AI গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এন্টারপ্রাইজগুলির সাথে জোট তৈরি করছে। ইউকে সরকার এবং IBM-এর মধ্যে পাঁচ বছরের অংশীদারিত্বের মতো উল্লেখযোগ্য সহযোগিতাগুলি AI, কোয়ান্টাম প্রসেসিং এবং ডেটা অ্যানালিটিক্স 9-এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে। কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং AI উভয় ক্ষেত্রেই অত্যাধুনিক উন্নতির জন্য এই সহযোগিতাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ডোমেনের বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করে, তারা আন্তঃবিষয়ক গবেষণা এবং উন্নয়নকে উৎসাহিত করে, ক্ষেত্রটিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যায়।

কোয়ান্টাম-এআই ভবিষ্যত

কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর প্রাথমিক পর্যায় এবং সামনের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং এআই একত্রীকরণ উদ্ভাবনী সমাধানে ভরা একটি উত্তেজনাপূর্ণ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দেয়। কোয়ান্টাম প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের জন্য ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক গতিবেগ তাদের অতুলনীয় উদ্ভাবন চালানোর সম্ভাবনা নির্দেশ করে। ভবিষ্যতে, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং এআই বিভিন্ন সেক্টরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা, ফিনান্স, লজিস্টিকস এবং উপকরণ বিজ্ঞানের মতো

শিল্পগুলি কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর প্রক্রিয়াকরণ শক্তি এবং AI এর অন্তর্দৃষ্টি বের করার ক্ষমতার শক্তিশালী সংমিশ্রণ থেকে উপকৃত হয়। আমরা কোয়ান্টাম-এআই যুগের গভীরে প্রবেশ করার সাথে সাথে আমরা একটি প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সাক্ষী হতে প্রস্তুত যা আমাদের বিশ্বকে বদলে দেবে। কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং এআই-এর মিলন একটি ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দেয় যেখানে প্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে, জটিল চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করে এবং মানবতাকে জ্ঞান ও অর্জনের অভূতপূর্ব সীমান্তের দিকে চালিত করে।

মিরাজ রহমান
কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং কোয়ান্টাম এআই নিয়ে গবেষণারত
তথ্য ও প্রযুক্তি গবেষণা ল্যাবরেটরি
চংছিং বিশ্ববিদ্যালয়, চংছিং, চীন।

CHINESE EDUCATION

Chinese education is a multifaceted system shaped by historical, cultural, and societal factors. Rooted in Confucian traditions, it places a paramount emphasis on academic excellence, discipline, and respect for authority. The educational journey begins with the compulsory nine years of basic education, comprising six years of primary school and three years of junior secondary school. Students then enter three years of senior secondary education. The culmination of this educational odyssey is the gaokao, China's fiercely competitive national college entrance examination.

From an early age, Chinese students face a demanding curriculum that heavily leans towards science, technology, engineering, and mathematics (STEM) subjects. This focus reflects the nation's commitment to fostering a highly skilled workforce to drive technological and economic advancements. However, the intense emphasis on STEM subjects has drawn criticism for potentially stifling creativity and neglecting other essential skills such as critical thinking and creativity.

Discipline is a cornerstone of Chinese education. Classrooms are often characterized by a strict teacher-student dynamic, where students are expected to listen attentively, memorize vast amounts of information, and adhere to a tightly regulated schedule. The emphasis on discipline is believed to instill a strong work ethic, essential for success in the competitive academic environment and later in the professional world.

The gaokao, held annually in June, is a high-stakes examination that determines a student's eligibility for admission to higher education institutions. The results of this exam hold immense significance, influencing not only the students' academic futures but also their social standing and family pride. The intense competition for limited spots in prestigious universities has led to a hyper-competitive culture, often criticized for its impact on students' mental health and well-being.

In recent years, there has been a growing awareness of the drawbacks of the Chinese education system. Critics argue that the emphasis on rote memorization and standardized testing may hinder the development of critical thinking and creative problem-solving skills. Efforts have been made to introduce reforms that promote a more holistic and student-centered approach, encouraging creativity, independent thinking, and a broader range of talents.

Another notable aspect of Chinese education is the prevalence of extracurricular activities and additional tutoring outside of regular school hours. Many students participate in a myriad of

extracurricular activities, from music and sports to various academic competitions. Additionally, the popularity of private tutoring services, known as "shadow education," highlights the intense pressure and competition students face, as families invest heavily in their children's education to secure a competitive edge.

The education system also reflects China's regional disparities, with urban schools generally having more resources and opportunities than their rural counterparts. Efforts have been made to address this imbalance, with policies aimed at improving the quality of education in rural areas and providing equal opportunities for students regardless of their geographic location. In conclusion, Chinese education is a complex and evolving system deeply ingrained in cultural values, emphasizing discipline, academic rigor, and success in STEM subjects. While the system has garnered international recognition for producing high-achieving students in standardized tests, ongoing discussions, and reforms are seeking to strike a balance between academic excellence and fostering well-rounded individuals prepared for the challenges.

Agnibha Chakraborty

Bachelor,

Electrical Engineering and Automation,

North China Electric Power University, Beijing, China.

Navigating the Paradox: Exploring the Dual Experience of Celebrity Phenomenology in the Public and Private Selves

In Muriel Spark's "The Public Image," the protagonist Annabel Christopher grapples with the intricate balance between her public persona and private life, a theme central to the extensive realm of celebrity studies. This nuanced exploration of the tension, traditionally scrutinized through Sartre's phenomenology, takes a compelling turn as the analysis adopts Merleau-Ponty's distinctive perspective.

The paper delves deeply into the ethical quagmire faced by celebrities in orchestrating the management of their public image. Proposing a virtuous approach, it advocates not for a wholesale embrace or rejection but rather for a thoughtful acceptance of the conflict, urging creative solutions that allow the public and private selves to coexist harmoniously.

Extending beyond the confines of the novel, the paper confronts the noticeable gap in philosophical discourse surrounding the phenomenon of fame. It provocatively suggests a profound philosophical examination of this societal phenomenon, employing the lenses of phenomenology and ethics to enrich our comprehension of the complex tapestry woven by celebrity.

Celebrities, curiously a subject often relegated to the sidelines in philosophical discourse, found an early contemplator in Jean Jacques Rousseau. Emerging as an inadvertent European celebrity post the provocative "Discourse on the Arts and Sciences" in 1750, Rousseau eloquently conveyed the burdensome and alienating nature of fame in his subsequent "Confessions." Here, he vividly delineated the schism between his 'public' and 'private' self, characterizing his public persona as a meticulously crafted 'lie' imposed by an inscrutable public gaze.

Rousseau's profound apprehensions prompted him to dedicate an entire

manuscript, titled "Rousseau, Judge of Jean-Jacques: Dialogues," to a meticulous exploration of the consequences stemming from the division between his private and public selves. He astutely observed the diminishing control he exerted over his public image, with the public even arrogating the authority to coin a new name for him. This palpable lack of control resulted in a profound sense of disconnection, with Rousseau feeling conspicuously isolated and compelled to refer to his public self in the detached third person.

At the heart of this disconnection lies the potent force of objectification, a phenomenon through which celebrities often feel 'owned by the public.' The transformation of the self into a commodifiable entity can be emotionally taxing, fostering an environment ripe for alienation. Interestingly, this disassociation is heightened when a public persona infiltrates the sacred precincts of a celebrity's private life, causing the 'original' self to be cast aside as inauthentic—a recurrent motif within the broader narratives of celebrity experiences.

Yet, intriguingly, celebrities find themselves unable to extricate fully from their public personas, particularly when these personas intertwine intimately with their personal lives. This interconnectedness becomes glaringly apparent in moments of upheaval, where a tarnished public image sends ripples of distress into the personal sphere of the celebrity.

The paradoxical nature of the celebrity experience is thus characterized by a simultaneous sense of disconnection and connection, alienation and belonging. A comprehensive analysis of the phenomenology of fame and celebrity necessitates grappling with this intricate dual experience, recognizing and elucidating the complex relationship between a celebrity's public and private selves.

Sonia Akter
School of Energy Power & Mechanical Engineering,
North China Electric Power University,
Beijing, China.

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শামসুল হকের সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন : মহাপ্রাচীরের পক্ষ থেকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। কেমন আছেন?

উত্তর : মহাপ্রাচীরের পাঠকসহ আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি।

প্রশ্ন : প্রায় ৪৫ বছরের বেশি সময় ধরে আপনি চীনে অবস্থান করছেন। চীনে পড়াশোনা, ক্যারিয়ার, পরিবার ও সামাজিক জীবন নিয়ে আপনার যে জার্নি সেই অভিজ্ঞতা আমাদের পাঠকগণ জানতে চান।

উত্তর : ১৯৭৮ সালে আমি বেইজিং, চীনে চীনা সরকারি স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য আসি। সেই সময় আমরা প্রথম চারজন বাংলাদেশী চীনা সরকারি স্কলারশিপ পাই। প্রথমে আমি ব্যাচেলর ডিগ্রি, তারপর মাস্টার্স শেষ করি। আমি ১৯৮৬ সালে পড়াশুনা শেষ করে ক্যারিয়ার শুরু করি। বেইজিংয়ে ৪৫ বছর ধরে আছি। ব্যক্তিগত জীবনে সংসার, ক্যারিয়ার নিয়ে খুব সুখি। আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্ন : পেশায় আপনি একজন সফল ইঞ্জিনিয়ার। আপনার ক্যারিয়ারের শুরুটা কীভাবে?

উত্তর : আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির জিও ফিসিক্সসের ছাত্র ছিলাম। অনার্সে পড়াকালীন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একটা সেমিনার হয়। সেই সেমিনারে মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে খুব বিশদ আলোচনা এবং বাংলাদেশে আগামী দিনে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের খুব চাহিদা হবে সেই খুব ফোকাস করা হয়। আমি এই সেমিনারের পর আমার ক্যারিয়ার প্ল্যান পরিবর্তন করি। সাথে সিদ্ধান্ত নিই, আগামী দিনে আমি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হবো। সেই সময়ে মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে পড়াশুনোর জন্য বাংলাদেশে কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মাইনিং নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য কয়েকটা দেশ তখন বেশ সুনামধারী ছিল। তন্মধ্যে চীন অন্যতম। চীনা স্কলারশিপ প্রোগ্রামের জন্য দূতাবাসের মাধ্যমে

আবেদন করার পর পরীক্ষা ও ভাইভা দেওয়ার পর আমি মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দুই

ক্যাটাগরিতেই টিকলাম। কোন বিষয়ে পড়তে চাই এটার সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য ৪৮ ঘন্টা সময় ছিল। পরিবারের সাথে আলোচনা করলাম কোন বিষয়ে পড়তে যাব। আমার ইচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং আর পরিবার চায় ডাক্তারি পড়াতে। এই নিয়ে পরিবারের লোকজন দোটানায় পরে গেল। কিন্ত আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল। পরের দিন যখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিংকে সিলেক্ট করলাম, উপস্থিত দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ আমার এই সিদ্ধান্তে বেশ আশ্চর্যই হয়েছিলেন। চীনে এসে মাইনিং এর উপর বিএসসি

এবং এমসসি সম্পুর্ণ করি। আর সে সুবাদে বেইজিংয়ের অনেক আন্তর্জাতিক কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছি।

প্রশ্ন : বর্তমানে আপনি বেইজিংয়ে পাঞ্জাব ও শালিমার নামে দুটো রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করছেন। রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় আসার কারণটা কী?

উত্তর : বেইজিংয়ে পাকিস্তানি, ভারতীয় ও তুর্কি রেস্টুরেন্টগুলো তাদের দেশের নামেই পরিচিত। কিন্ত বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট দেশের নামে সেইভাবে পরিচিত না। আমরা চাই বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট চায়নাতে একটা ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে আমরা তিনবছর পূর্বে এই রেস্টুরেন্ট চালু করি। একইসাথে আমার কাছে মনে হয়েছে রেস্টুরেন্টের সাথে জড়িত থাকলে বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথেও যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। বেইজিংয়ে বর্তমানে বিদেশী রেস্টুরেন্টের ভেতর আমাদের পাঞ্জাব রেস্টুরেন্ট সবচেয়ে বড়। আমাদের পাঞ্জাব এবং সালিমার নামে দুইটা রেস্টুরেন্ট আছে।

প্রশ্ন : আধুনিক চীনের যে উত্থান, তা বলা যায় আপনার চোখের সামনে ঘটেছে। তাদের এই উন্নয়নের পেছনে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

উত্তর : চীনের উন্নয়ন এবং অল্প সময়ে এই বিশাল সফলতার পেছনে আমার কাছে মনে হয় চীনাদের পরিশ্রম ও সততা ও একই সাথে দেশপ্রেম। আমি যতজন চীনা নাগরিকের সাথে কাজ করেছি, আমার

কাছে মনে হয়েছে তাদের দেশের প্রতি ভালবাসা অপরিসীম। তাদের এই কয়েকটা গুণের কারণেই আজকে চীনের এই বিশাল সফলতা।

প্রশ্ন : বর্তমানে চীন বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অন্যতম একটা পছন্দের জায়গা। দিন দিন প্রচুর বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্য চীনে আসছেন। আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের জন্য কী পরামর্শ দেবেন?

উত্তর : বর্তমানে চীন বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উচ্চ শিক্ষার জন্য পছন্দের শীর্ষে। চীনে যেসব বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্য অবস্থান করছেন সবার উদ্দেশ্যে

একটিই পরামর্শ। সততার সাথে জ্ঞান অর্জন করা এবং একই সাথে এমন কোনো কাজের সাথে জড়িত না হওয়া যার দ্বারা দেশের সম্মানহানি হয়। আর সম্ভব হলে চীনা ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করা।

প্রশ্ন : বেশ দীর্ঘ সময় ধরে চীনে অবস্থান করছেন। দেশের কোন জিনিসটা বেশি মিস করেন?

উত্তর : দীর্ঘ সময় চীনে থাকার পরেও দেশের অনেক কিছুই মিস করি। যেমন - খাবার, স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির বন্ধুসহ, আত্মীয়-স্বজন এবং এলাকার লোকজনকে।

প্রশ্ন : বেইজিংয়ে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে আপনি একজন জনপ্রিয় মানুষ। এইখানে বাংলাদেশীদের নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী? এর সঙ্গে মিলিয়ে অন্যান্য বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন।

উত্তর : আসলে আমার বিদেশ বা চায়না জীবন যেভাবেই বলেন না কেন আমার যাত্রা শুরু এই বেইজিং থেকেই। গত ৪৫ বছর থেকে আমার বেইজিংয়ে বসবাস। এখানে অনেক বাংলাদেশী মানুষ বসবাস করেন না। যে কয়জন আছেন তাদের সবার সাথে আমাদের খুব চমৎকার একটা সম্পর্ক

রয়েছে। একটা কথাই বলি, আমরা পৃথিবীর যে যেখানেই থাকি আমাদের দেশের সংস্কৃতি বা দেশকে ভুলে গেলে চলবে না। যারাই এখন বেইজিং তথা চায়নাতে আছেন সবার উদ্দেশ্যে একটাই কথা দেশকে ভালোবাসতে হবে। আর সুযোগ পেলে দেশের জন্য কিছু করার চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন : ২০২৩ সালে বাংলাদেশ ৫২তম মহান বিজয় দিবস উৎযাপন করছে। এই ৫২ বছরে আপনার চোখে বাংলাদেশ কোন কোন বিষয়ে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে?

উত্তর : বাংলাদেশ অনেক সেক্টরেই গত ৫২ বছরে তার সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে সবচেয়ে যে ব্যাপারটাতে খুব চমৎকারভাবে সফল হয়েছে তা হলো হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম। খুব বেশিদিন আগে না, আমরা যদি গত এক বা দেড় যুগ আগের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বর্তমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখি তাহলে আমরা আকাশ-পাতাল তফাৎ পাব। তাই, আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার এক যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছে।

প্রশ্ন : প্রবাসে বিজয় দিবস নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা মহাপ্রাচীরের পাঠকদের সাথে শেয়ার করবেন কি?

উত্তর : বাংলাদেশের যেকোনো জাতীয় দিবসকে আমি খুব মিস করি। বেইজিংয়ে বিজয় দিবসে বাংলাদেশ কমিউনিটি কর্তৃক আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের আয়োজন অতীতে করেছি। খেলা-ধুলা, গেট টুগেদার। এর পাশাপাশি দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করা হয়। তবে ছাত্রজীবনের দূতাবাস ও বাংলাদেশ কমিউনিটির বিজয় দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানগুলোর কথা খুব মনে পড়ে। সেই দিনগুলো খুব মিস করি।

প্রশ্ন : মহাপ্রাচীরের দশম সংখ্যায় আপনার মূল্যবান অভিজ্ঞতা পাঠকদের সাথে শেয়ার করার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

উত্তর : আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য। বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সবার জন্য শুভেচ্ছা।

(বেইজিং বাংলাদেশী কম্যুনিটির জনপ্রিয় মুখ ও বাংলাদেশীদের মধ্যে প্রথম চীন সরকারি শিক্ষাবৃত্তিপ্রাপ্তদের অন্যতম **ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শামসুল হক**। চীনে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশীদের কাছে তার জীবন ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন তিনি। **সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন— জান্নাতুল আরিফ, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ-চীন ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন; নির্বাহী সম্পাদক, মহাপ্রাচীর।**)

মেঘে ঢাকা মহাপ্রাচীর

চীনে পা রাখার প্রায় অর্ধ বছর হতে চললো। অথচ সেই অর্থে ভ্রমণের তেমন একটা সুযোগ পাইনি। যতটুকু ঘুরেছি তাতেই বন্ধুদের সবাই বলে আমি একটু বেশি ঘোরাঘুরি করি। অনেকের তাতে নাক ছিটকানো ভাব। টুকটাক ভ্রমণের চালচিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও শেয়ার দিচ্ছি। অধিকাংশের ধারণা নতুন নতুন চায়নাতে এসেছি তাই বোধহয় এত আগ্রহ। আমারও তাই মনে হয়। নতুন দেশে এসে যদি ঘোরাঘুরি না করি তবে দেশে থাকলেই না ভালো। কষ্ট করে বিদেশ আসার তো কোনো মানে হয় না।

এত বড় দেশ, নতুন মানুষ, নতুন সংস্কৃতি সবকিছুই রহস্যের মতো লাগছে। যে মানুষটা কদিন আগেও ঢাকার অলিগলিতে একা একা ঘুরে বেড়াতো সে এখন বিদেশ বিভূঁইয়ে অপরিচিত মানুষের ভিড়ে নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করছে! এতটুকু আগ্রহ আছে বলেই পরিবার-পরিজন ছেড়ে এতদূরে একা একা থাকতে পারছি। দিন যত যাচ্ছে ততই চীনের মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা তৈরি হচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসেও আগ্রহ বাড়ছে।

নিজেকে খোঁজাখুঁজি করার অভ্যাস অনেক আগে থেকেই। মানুষ যদি নিজেকে খুঁজতে চায় তবে তাকে পরিচিত গণ্ডির থেকে বের হতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে জীবনকে আমি যাযাবরের মতো কাটাতে চাই। যে জীবনের কোনো উদ্দেশ্য কিংবা বিধেয় থাকবে না। কেবলই উদযাপন করে বাঁচবো। জীবনকে যদি উদযাপন করার পরিকল্পনা থেকে থাকে সেখানে ভ্রমণ হওয়া উচিত প্রধান উপাদেয়। আমি যে কোনো এককালে ভবঘুরে হবো সে তো অনেকদিনের

বাসনা। কিন্তু ভবঘুরে শাস্ত্রে দীক্ষা থাকলেই তো হবে না। পাশাপাশি প্রস্তুতিও থাকা চাই। সে মানসিক হোক, শারিরিক হোক বা আর্থিকভাবে হোক। আমার সবগুলো রয়েছে শুধু সময়ের অভাব। রথ দেখতে এসে কলা বেচবো তো না হয় ঠিক আছে তবে রথটাও তো দেখতে হবে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়াও চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

এক কাল্পনিক জীবনকে আমি আমার হাতের মুঠোয় পেয়েছি। দেশ আর পরিচিত মানুষের থেকে যখন দূরে সরে এসেছি তখন যেভাবেই হোক এই জীবনকে উপভোগ করতে হবে। কিন্তু সেজন্য যতটুকু ভ্রমণ প্রয়োজন তা করতে পারছি না দেখে মনে মনে অশান্তিও কম নয়। সুযোগ পেলেই কিছুক্ষণের জন্য বেড়িয়ে পড়ি। গাছপালা, রাস্তাঘাট, দোকানপাট আর অপরিচিত মুখের ভিড়ে আমি এক কাল্পনিক ফেরারি জীবনকে খুঁজে বেড়াই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস, প্রফেসরের কাজ যেন পিছু ছাড়ছে না। প্যারাহীন ঘোরাঘুরি করবো তার কোনো ফুরসত নেই। যতটুকু ঘোরাঘুরি করার সুযোগ পাচ্ছি তাতে নিজের সাথে নিজে খুশি নই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও ক্যাম্পাসের চারপাশে পা রাখার মতো যত জায়গা আছে সেখানে একবার হলেও ঢুঁ মেরেছি। কিন্তু মন আনচান করছে আরো বিস্তৃত জায়গায় যেতে।

চীনের যতগুলো প্রাচীন শহর রয়েছে তার মধ্যে আমি যে শহরে থাকি সেটিও অন্যতম। শিয়ানে প্রায় তিন হাজার বছরের সভ্যতা। সিল্ক রোডকে ঘিরে চায়না থেকে ইউরোপ পর্যন্ত যে অর্থনৈতিক

যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিলো তার গোড়াপত্তন শিয়ান শহরেই। চীনের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই শহরটি শানশি প্রদেশের রাজধানী।

শিয়ান শহর প্রাচীন স্থাপনার জন্য খুব বিখ্যাত। সমস্ত শহরটাকে মস্ত বড় সব পাহাড় ঘিরে রেখেছে। ডরমিটরি থেকে ঘণ্টা তিনেক পথ পেরুলেই যে কোনো পাহাড়ে ঠাঁই নেওয়া সম্ভব। এখানকার খাবার দাবাড়েও রয়েছে নিজস্বতা। মানুষরাও বেশ আন্তরিক। কিছুকাল এখানে কাটালে যে কেউ এই জনপদটিকেও নিজের শহর বলে গ্রহণ করবে। যেমনটা আমি করেছি। বরগুনার প্রত্যন্ত গ্রাম ছেড়ে বরিশাল কিংবা ব্যস্ততম ঢাকার মতো শিয়ানকেও এখন নিজের শহর বলে মনে হয়।

শিয়ানে ঘোরার মতো জায়গার অভাব নেই। বেশ কিছু বিখ্যাত জায়গায় ইতোমধ্যে ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে। এবার শহর ছেড়ে ভিন্ন কোথাও যেতে হবে। সুযোগ খুঁজছি কোনো প্রত্যন্ত গ্রাম কিংবা দুর্গম পাহাড়ে যাওয়ার। কিন্তু একা একা যাওয়া অনেকটা মুশকিল। চীনা ভাষা না জেনে একা একা ভ্রমণ করা কতটা দূরহ ব্যাপার; তা যাঁরা করেছেন তারাই ভালো বুঝবেন। এখানে নতুন কেউ এসে ঘর ছেড়ে এক পা এগোতে পারবে কি না সন্দেহ আছে।

চীন এত বড় একটা দেশ অথচ আমি এখনও নিজের শহর ছেড়ে বাইরের কোনো প্রদেশে যেতে পারিনি। এ এক আক্ষেপও বটে। ছোটবেলা থেকে চায়না সম্পর্কে যখনই ভেবেছি তখনই গ্রেট ওয়াল অব চায়নার কথা মনে এসেছে। স্বামীহারা রূপবতী মেন জিয়াংশুর বেদনার কথা ভেবে কষ্ট পেতাম। প্রাচীরটি নির্মান করতে কয়েক লক্ষ শ্রমিক মারা যায়। যে কারণে মহাপ্রাচীরকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কবরস্থানও বলা হয়। এই সংখ্যা অনেকে দশ লক্ষ বলে দাবী করলেও আমার বিশ্বাস হয় না। তবে যে মানুষগুলো প্রাচীর নির্মান করতে গিয়ে মারা যায় তার মধ্যে সদ্য বিবাহিত মেন জিয়াংশুর স্বামীও ছিলো। মেই জিয়াংশুর বেদনা এতই তীব্র ছিলো যে তাঁর বেদনায় মহাপ্রাচীর খয়ে খয়ে দিনে দিনে ছোট হয়ে আসছে। ধসে পড়ছে পৃথিবীর অন্যতম এই প্রাচীন স্থাপনা। এছাড়াও কথিত আছে মহাপ্রাচীরই পৃথিবীর একমাত্র স্থাপনা যা কি না মহাকাশ থেকে দেখা যায়। নানা রূপকথায় জড়ানো মহাপ্রাচীর দেখার বাসনা ছোটবেলা থেকেই। এসব রূপকথার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হয়তো পাওয়া যাবে না কিন্তু যুগ যুগ ধরে যে রূপগল্প মানুষের মনে গেঁথে আছে তা এড়ানোর-ই-বা উপায় কী!

প্রাচীন যুগ থেকে চীনের উত্তরাঞ্চল পৃথিবীর শস্য ভাণ্ডার। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ চীনের প্রতি নজর পড়ে মঙ্গোলিয়ার দস্যুদের। মঙ্গোলিয়দের কাজই ছিলো সমৃদ্ধশালী প্রতিবেশি দেশগুলোতে লুটতরাজ করা। বারবার আক্রোমন করে চীনাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছারখার করে দিত, লুটপাট করতো চাইনিজদের শস্য ভাণ্ডার। চীন তখন অনেকগুলো খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত। এক এক প্রদেশে এক এক রাজাদের রাজত্ব। সম্রাট শি হুয়াঙ নিজ উদ্যোগে সব রাজাদের একত্রিত করে মঙ্গোলীয় দস্যুদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ছিং(কিন) রাজবংশের সম্রাট শি হুয়াঙ প্রথমবারের মতো এই মহাপ্রাচীরের নির্মান কাজ শুরু করেছিলেন। ছিং রাজবংশের পর অন্যান্য রাজবংশ যেমন মিন, হান রাজারাও এই মহাপ্রাচীরের

সংস্করণ, পরিবর্ধণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। প্রথম দিককার প্রাচীরের অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও মিন ও হান রাজাদের তৈরি করা মহাপ্রাচীর এখনও টিকে আছে। পৃথিবীর সমস্ত ভ্রমণপিপাসুদের মতো মহাপ্রাচীরে পদধুলি দেওয়ার বাসনা সেই ছোটবেলা থেকে। মহাপ্রাচীর নিয়ে যত পড়েছি ততই বিস্ময় বেড়েছে। চীনে যখন পা রেখেছি তবে একবার হলেও মহাপ্রাচীর ভ্রমণের সুযোগ মিলবে সেই বিশ্বাস অন্তত আমার ছিল। শীত ও বসন্ত শেষে গ্রীষ্মের আনাগোনা শুরু হয়েছে। এ অল্প কদিনে গ্রীষ্মের উত্তাপ দারুণভাবে বোঝা যাচ্ছে। গত ছয় মাসে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঘর থেকে বের হওয়া ছিল দায়। এখন গা ঝাড়া দিয়ে বাইরে বের হওয়ার পালা। এখানকার বসন্তকে বাংলাদেশের শীতকালের সাথে তুলনা করলে ভুল হবে না। সমস্ত বসন্ত জুড়ে সোয়েটার পরে কাটিয়েছি। আমার শীত অনুভূতি বেশি বলে নয়, অন্যদেরও একই অবস্থা। তবে এই বসন্তের কোনো রুক্ষতা ছিলো না। এখানকার বসন্ত একটু বেশি মোলায়েম। আবহাওয়ার শীতল ভাব শরীরের সাথেও মনটাও মখমলের মতো নরম করে রাখে। তবে আশ্চর্য্যের ব্যাপার হচ্ছে গরমেও তাপমাত্রা অসহ্যনীয় পর্যায়ে চলে যায়। শীতে যে শহরে নিয়ম করে বরফ পড়ে, বসন্তে সোয়েটার পরে কাটাতে হয় সেই একই শহরে গরমে গা পুড়ে যাবার উপক্রম। ভ্যাপসা গরমে অস্থির লাগে। তা-ও ভালো, শীতের কুনো ব্যাঙের মতো কাটাতে হবে না।

চায়নার শিক্ষা ব্যবস্থার অনেকগুলো ভালো দিকের মধ্যে আরেকটি ভালো দিক হচ্ছে প্রতি সেমিস্টার পরবর্তী দীর্ঘ ছুটির সময়। এখানের ছাত্রদের সারা বছরে প্রায় তিন মাস একাডেমিক লেখাপড়া করতে হয় না। শীত ও গ্রীষ্ম মিলিয়ে এই সময়কে তাঁরা অবকাশের জন্য কাজে লাগায়। তবে গবেষণারত পিএইচডি ও মাস্টার্স ছাত্রদের জন্য এই সুযোগ যদিও কিছুটা কম। দীর্ঘ অবসরে ছাত্ররা যে যার নিজের ইচ্ছানুযায়ী সময় কাটায়। কেউ ঘুরতে বের হয়, কেউ কাজ করে, কেউ হয়তো গ্রামের বাড়িতে পরিবারের সাথে সময় কাটায়। আমি সম্পূর্ণ ছুটিকে ঘোরার কাজে লাগাবো বলে পরিকল্পনা করে রেখেছি। প্রফেসরকে জানানোর পর তিনি বললেন– তাঁর কোনো স্টুডেন্টকে তিনি ছুটি দেননি। আমাকেও দিতে পারবেন না। সিদ্ধান্ত নিলাম ঘোরাঘুরির ব্যাপারে যা করবার প্রফেসরকে না জানিয়েই করতে হবে। আমার তখনও ল্যাবে জয়েন করতে হয়নি।

এ বছরের গ্রাজুয়েটরা ক্যাম্পাস না ছাড়ার কারণে ল্যাবে কোনো ফাঁকা জায়গা ছিল না। সুতরাং পরবর্তী সেমিস্টার অবধি নিজের মতো করে সময় কাটানোর এই সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

গ্রীষ্মের ছুটিতে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ যখন পাবো তবে সেটা কেন মহাপ্রাচীর নয়। প্রথম প্রথম থাইল্যান্ড ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিলো। বন্ধু ও ছোট ভাই তীর্থের জন্য সেই পরিকল্পনা বাদ দিয়েছি। তীর্থাঙ্কর দত্ত এবং আমি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। এখানে আসার পর থেকে তীর্থই আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। চায়নার জীবন সম্পর্কে তীর্থ আমাকে সবকিছু হাতে ধরে শিখিয়েছে। অনেকে আমাদেরকে সহোদর বলে জানে। কোনো রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও আমাদের আত্মার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। এই ছেলেটা না থাকলে আমার এখানকার জীবন দূর্বিষহ হতে পারতো। একা একা কাটাতে হতো অনেকটা সময়। কম্পিউটার প্রকৌশলে ব্যাচেলর শেষ করে তীর্থ বর্তমানে আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিনে অধ্যয়নরত।

লেখাপড়া শেষ না হতে হতেই আমেরিকার বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তীর্থের অ্যাডমিশন হয়েছে। আমেরিকা যাওয়ার পরবর্তী ধাপ হিসেবে ভিসার ইন্টারভিউ তখনও বাকি। তীর্থ যখন বললো সে ভিসার কাজে শেনইয়াং যাবে তখনই মনস্থির করেছি তীর্থের সাথে ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে গেলেই বরং ভালো হবে। সে-ও যখন বললো– ভাই, আমার সঙ্গে চলেন। দুজনে একত্রে ঘুরে আসবো ফাঁকে ভিসার কাজও হয়ে যাবে। আমিও সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলাম। থাইল্যান্ডের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে তীর্থের ভ্রমণে সায় দিলাম। যথারীতি দুজনে মিলে ভ্রমণ পরিকল্পনাও করে ফেলছি।

শেনইয়াং লিয়াওনিং প্রদেশের রাজধানী। ছোট এবং সুন্দর শহর। চায়নাতে আমেরিকা অ্যাম্বাসির অল্প কয়েকটি কনসুলেট অফিসের মধ্যে শেনইয়াংয়েও অ্যাম্বাসির একটি শাখা রয়েছে। বেইজিং কনস্যুলেট কাছাকাছি তবে ভ্রমণের কথা চিন্তা করে একটু দূরে যাওয়ার পরিকল্পনা আমাদের। হোটেলে থাকার ব্যয় ও সামগ্রিক খরচের ব্যাপারটিও ছিল বেইজিংয়ে না যাওয়ার অন্যতম কারণ। বিশেষ করে রাতে হোটেল ভাড়ার অতিরিক্ত খরচ করার ইচ্ছা নেই কারো।

লাগলেও বিমানের থেকে এর ভাড়া বেশি। ঘন্টায় তিনশো কিলামিটারের বেশি উচ্চ গতিতে চলা এই ট্রেন যাত্রা বেশ আরামদায়ক। এখন অব্দি আমার এই ট্রেনে চড়ার সুযোগ হয়নি। সার্বিক কথা চিন্তা করে বিমানে যাওয়ার কথা ভেবেছি কিন্তু বিমান ভ্রমণে সময় খুবই লাগবে, দেখার মতোও কিছু থাকবে না। তীর্থকে বললাম ধীর গতি লোকাল ট্রেনের সময়সূচী দেখতে। আমাদের হাতে যেহেতু যথেষ্ট সময় রয়েছে তাই ট্রেন থেকে চারপাশের পরিবেশ দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে। ধীর গতির ট্রেনগুলো সাধারণত লম্বা রুটের হয়। গ্রামের লোকজন এসব ট্রেনে চলাফেরা করে। লোকাল ট্রেনের কিলোমিটার। ধীর গতির ট্রেনে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে সাতাশ ঘণ্টা লাগবে। শুনে মোটামুটি আঁৎকে উঠেছি! প্রথমে ভেবেছিলাম দশ থেকে পনেরো ঘণ্টা লাগতে পারে। কিন্তু এত সময় লাগবে তা ধারণার বাইরে ছিলো।

যেহেতু শেনইয়াং যাত্রা পথে বেইজিং পার হয়েই আমাদেরকে যেতে হবে। তাই ফেরার পথে ভিসার কাজবাজ শেষ করে সারাদিন বেইজিং কাটিয়ে ফের রাতের ট্রেন ধরার পরিকল্পনা। চীনের এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে যাওয়ার বেশ কতগুলো উপায় রয়েছে। এর মধ্যে জনপ্রিয় ও সময় সাপেক্ষ হচ্ছে বিমান ও উচ্চ গতির ট্রেন। এই উচ্চ গতির ট্রেন সবার কাছে বুলেট ট্রেন নামে পরিচিত। বুলেট ট্রেনে সময় কম

মতো স্টেশনে থামিয়ে লোক নেয়। এসব কথা শুনে আরো কিছুটা লোভ বাড়লো। শিয়ান থেকে শেনইয়াংয়ের দূরত্ব প্রায় সতেরো হাজার

চায়নার গ্রামাঞ্চলে কখনো যাওয়ার সুযোগ হয়নি। লোকাল ট্রেনে সেই সুযোগ কিছুটা হলেও পাওয়া যাবে। নিতান্ত সাধারণ মানুষদের দেখার সুযোগ পাবো। ট্রেনে কামরার পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে একটু হলেও তাঁদের জীবন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। শহরে মানুষদের দেখার মধ্যে কিছু নেই।

সবাই ভালো থাকার ভান করে, আচরণেও যান্ত্রিকতা, সবকিছুতে ফাঁকি ফাঁকি ভাব। বিরাট এক কৃত্রিমতা গিলে খায় শহুরে নাগরিকদের। চীনের মানুষদের বুঝতে হলে মাটির কাছাকাছি যেতে হবে। গ্রামের সাধারণ মানুষের ভিড়ে প্রকৃত চায়নাকে কিছুটা হলেও আবিষ্কার করা সহজ হবে। আপাতত এই ফূর্তিতে দিন কাটছে। কিন্তু বিপত্তি ঘটালো ট্রেনের সময়সূচী।

সম্পূর্ণ একটা দিনের থেকেও বেশি সময় আমাদের ট্রেনে কাটাতে হবে! প্রথম প্রথম আগ্রহ থাকলেও সময়ের কথা শুনে সেই আগ্রহ কেটে গিয়েছে। পরবর্তীতে টিকিটের দাম দেখে পুনরায় আগ্রহ বেড়েছে। বুলেট ট্রেনের অর্ধেকের থেকেও কম দাম! আমাদের হাতে যেহেতু যথেষ্ট সময় আছে এবং টাকা বাঁচানোর সুযোগ পেয়েছি তবে ধীর গতির ট্রেনই ভালো। অর্থ যে কষ্ট করতে অনুপ্রেরণা দেয় তা আবারও টের পেলাম। এখানকার সব কাজের মুসকিল-আসান হচ্ছে উইচ্যাট নামের একটি মোবাইল অ্যাপ। ইন্টারনেটের এমন কিছু নেই যা উইচ্যাট দিয়ে করা সম্ভব না। বার্তা আদান-প্রদানের পাশাপাশি যানবাহনের টিকিট বুকিং দেওয়া, টাকা-পয়সা লেনদেন সবকিছুই এই আজব অ্যাপটি দিয়ে করা সম্ভব। উইচ্যাট থেকে আমরা দুজনার জন্য টিকিট কাটলাম।

টিকিট প্রাপ্তির ঝামেলা এড়াতে সপ্তাহ দুয়েক আগে ট্রেনের টিকিট কেটে রেখেছি। তীর্থ শেনইয়াংয়ের একটা হোটেলেও বুকিং দিয়ে রেখেছে। হোটেল বুকিং দেওয়া আরেক যন্ত্রণা। সব হোটেলে বিদেশীদের থাকার সুযোগ নেই। নির্দিষ্ট কিছু হোটেলে বিদেশী পর্যটকদের থাকার অনুমতি আছে। তাও পাসপোর্ট, ভিসা সহ সকল ধরণের কাগজপত্র সঙ্গে রাখতে হয়। কিছুটা বিলম্ব হলেও আমরা হোটেল বুকিং করতে পেরে স্বস্তিতে আছি। গুয়াংজু বা সাংহাইয়ের মতো পর্যটক বান্ধব শহরগুলোতে বিদেশীদের জন্য হোটেল পেতে সমস্যা হয় না। অপেক্ষাকৃত ছোট শহরগুলোতে ভ্রমণে গেলে রাত্রিযাপন নিয়ে সমস্যা পড়তে হয়। ইতিপূর্বে সেই সমস্যায় পড়েছি বলে এবার বাড়তি সতর্কতা। প্রয়োজনীয় ব্যাগপত্র গুছিয়ে শেনইয়াংয়ের উদ্দেশ্য রওনা দিয়েছি। তীর্থকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিলাম ওর ভিসা ইন্টারভিউয়ের কাগজপত্র ঠিকঠাকভাবে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য। ব্যাগপত্রের সাথে আমার ব্লগিং গ্যাজেট নিয়ে বের হলাম। উদ্দেশ্য যাত্রাপথে ছোট ছোট ভিডিও তৈরি করা। বিশেষ করে লোকাল ট্রেনের দীর্ঘ জার্নিটাকে ক্যামেরাবন্দী করার খুব ইচ্ছা। চায়নাতে আসার পর প্রত্যেকেরই ইচ্ছা থাকে উচ্চ গতির বুলেটে ট্রেনে চড়ার। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা লোকাল ট্রেন ভ্রমণের। সেটাকে ক্যামেরায় ধারণ করতে পারলে ব্লগের পাশাপাশি নতুন কিছু স্মৃতিও তৈরি হবে।

ডরমিটরি থেকে বের হয়ে সম্পূর্ণ পথে ছোট ছোট ভিডিও রেকর্ড করেছি। শিয়ান শহরে মোট দুইটি রেল স্টেশন রয়েছে। শিয়ান রেল স্টেশন এতটাই বড় যে আমি প্রথমে খানিকটা অবাক হয়েছিলাম। এত বৃহৎ ও জটিল স্থাপনা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। এখানকার ট্রেন ব্যবস্থাপনা বিমানবন্দরের মতো। তিন ধাপে নিরাপত্তা তল্লাসির পর যাত্রীরা ট্রেনে ওঠার সুযোগ পায়। আমাদেরকেও নানাভাবে তল্লাসি চালানো হলো।

স্টেশনে বাড়তি মানুষের কোনো ভিড় নেই। শুধুমাত্র টিকিটধারীরা ভেতরে ঢোকার সুযোগ পায়। নিরাপত্তা

কর্মীরা বেশ আন্তরিক। আমাকে একজন ভিডিও করতে বারণ করায় কিছুটা মনোক্ষুন্ন হয়েছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি মানিয়ে চলতে বিশ্বাসী। যেখানে সমস্যা মনে হয় সেখান থেকে কেটে পড়ি। এক্ষেত্রেও যেখানে কেউ ভিডিও করতে বারণ করেছে সেখানে আর ক্যামেরা অন করিনি। চাইনিজদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি হয়েছে ঠিকই তবে এখনও তারা কিছু ব্যাপারে বৈশ্বয়িক হতে পারেনি। সবকিছুকে খুব সহজে গ্রহণ করার প্রবণতা চাইনিজদের নেই। এরা নিজেদের মতো করে থাকতে অভ্যস্ত। সহজ জিনিসকে জটিল করে ভাবতে এরা অন্যদের থেকে এগিয়ে। এই সংকীর্ণতা যত দ্রুত দূর করতে পারবে চীন তত আরো এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

স্টেশনের বাইরে তেমন কোনো ভিড় নেই। সবকিছু স্বাভাবিক এবং নিরব। আমাদের দেশে যেমন সিএনজি, রিকশা জট লাগিয়ে রাখে তেমন কোনো আলামত এখানে দেখতে পেলাম না। শহরের মধ্যে মানুষজন সাবওয়ে মেট্রোতে যাতায়াত করে। সাবওয়ে স্টেশন প্রধান স্টেশনের মধ্যেই। সাবওয়েতে উঠতে হলে যাত্রীদেরকে স্টেশন থেকে বের হতে হয় না। ট্যাক্সির জন্য নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। যাত্রীরা সেখান থেকে ট্রাক্সি ভাড়া করে। সিটি বাস স্টপ খুব কাছাকাছি। সবকিছু নির্ধারিত জায়গায় সাজানো গোছানো। কারো কোনো অসুবিধা হয় না। বিদেশীদের জন্য চায়নাতে ভাষা নিয়ে বড় এক সমস্যা। তবে রাস্তাঘাটে বা যানবাহনের স্টেশনগুলোতে সবত্রই চীনা ভাষার পাশাপাশি ইংলিশ ব্যবহার করে। টয়লেট, রেলওয়ে লাইন এগুলো কোথায় তা নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। সব স্পষ্ট করে ইংলিশে লিখে দেওয়া রয়েছে।

রেলওয়ে স্টেশনের সবকিছু স্বয়ংক্রিয়। কিছু মানুষ রয়েছে যাঁরা শুধুমাত্র যন্ত্রগুলোকে দেখাশোনা করে। আবার জরুরি প্রয়োজনে যাত্রীদেরকে সহযোগিতা করে। শিয়ান রেলস্টেশনে দেয়াল জুড়ে বিশাল আকৃতির চিত্রকর্মগুলি দর্শনীয়। চীনাদের শিল্পকর্মের আলাদা বৈশিষ্ট রয়েছে। হাজারো পেইন্টিংয়ের মাঝে খুব সহজে চাইনিজ পেইন্টিং আলাদা করা যায়। আঁকাআঁকিতে রংয়ের পরিমিত ব্যবহার চাইনিজ শিল্পকে আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। রংয়ের বিশেষ ব্যবহারে আঁকার ঢং-ও আলাদা। ইউরোপীয় শিল্পের ধারাকে অনুসরণ না করে নিজস্ব স্বকীয়তাকে ধরে রাখার প্রয়াস চাইনিজ সংস্কৃতির অনন্য এক উদাহরণ। শিয়ান স্টেশনে ঢুকতেই তেমন একটা পেইন্টিংয়ে আমার চোখে পড়লো। সমস্ত দেয়াল জুড়ে হাজার বছর আগের শিয়ান শহরকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শিল্পীর আঁকা পাহাড় লাগোয়া গ্রামগুলো আমাকে আকৃষ্ট করেছে। পাহাড় বেয়ে বেয়ে মেঘ আছড়ে পড়ছে গ্রামগুলোর ওপর। ছবিটা জুড়ে এক ধরণের মাদকতা কাজ করছে। আমি সময় নিয়ে সেই মাদক গ্রহণ করলাম।

স্টেশনের ভেতরে একটি ভাস্কর্যকে ঘিরে সবার আগ্রহ। হুবহু ট্রেনের আদলে বানানো হয়েছে। আমিও ছবি তুললাম সেখানে। আমাকে দেখা মাত্র কয়েকটা বাচ্চা আগ্রহ নিয়ে এসে পাশে দাঁড়ালো। আমাদের ভাষা ভিন্ন হওয়ায় একটু কুশলাদি বিনিময় করবো সেই সুযোগও নেই। একে অপরের দিকে তাকিয়ে রয়েছি, কথা বলতে পারছি না। বাচ্চাদের সাথে মিশতে আমার ভালোলাগে। কিন্তু ওই প্রানবন্ত বাচ্চাদের সাথে যোগাযোগের কোনো উপায় খুঁজে পাইনি। আমি স্টেশনটা ঘুরে দেখার চেষ্টা করছি।

তীর্থকে বসিয়ে রেখেছি ব্যাগপত্র পাহারা দেবার জন্য। স্টেশনের বিভিন্ন জায়গার ছবি নিবো ভাবছি। তখনি তীর্থের ফোন পেলাম, ট্রেনের বোর্ডিং শুরু হয়ে যাওয়াতে স্টেশনটা ভালো করে ঘুরে দেখার আর সুযোগ হয়নি।

চীনে যে শত কোটি মানুষ তা এই রেল স্টেশনে এসে প্রথম টের পেয়েছি। ঢাকার সাথে তুলনা করলে শিয়ান শহরকে জেলা বা উপজেলার মফস্বলের মতো মনে হয়। রাস্তাঘাটে তেমন ভিড় থাকে না। গাছগাছালি সবখানে। রাস্তায় তেমন বড় কোনো ট্রাফিক জট নেই। অথচ এখানেও প্রায় কোটি মানুষের বসবাস। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিকঠাকমতো কাজ করলে বড় সংখ্যক জনগোষ্ঠিকেও শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব; চীনারা তা প্রতিনিয়ত দেখিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে যে কোনো দেশের জন্য চায়না আদর্শ হতে পারে।

পাসপোর্ট ও টিকিট বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অবশেষে ট্রেনে ওঠার সুযোগ পেয়েছি। এসব ট্রেনের পরিবেশ যে বুলেট ট্রেন বা বিমানের মতো ছিমছাম হবে না, প্রচণ্ড হৈ-হুলোড় থাকবে তা আগেই বুঝেছিলাম। তবে মনে মনে আমি এমনটাই চেয়েছি।

সহ যাত্রীদের বেশভূষা দেখে বোঝা যাচ্ছে এরা কেউ শহরে বাস করে না। কাজের জন্য শহরে কিছুকাল থাকলেও এদের আসল নিবাস গ্রামে। এরা নিম্নবিত্ত চাইনিজ, দেশের মূল চালিকাশক্তি এরাই। কৃষক কিংবা শ্রমিক শ্রেণির মানুষদের আমার ভালোলাগে। একটা আত্মার সম্পর্ক হয়তো রয়েছে। এদের হাসিতে কোনো রহস্য থাকে না। কথায় কোনো জটিলতা থাকে না। যা বলে তা ভেতর থেকে বলে; এদের ক্ষেত্রেও তাই। রেলের এই কামড়াটাকে গ্রামের বাজারের মতো হচ্ছে। শুধু কথা বলছে চাইনিজে। বাকিসব কর্মকাণ্ড আমার গ্রামের বাজারটির মতোই।

ট্রেনের কামড়ায় আমাদের দুজনকে দেখে সবার এক ধরণের আগ্রহ তৈরি হয়েছে। কারো কারো চোখেমুখে হাসি স্পষ্ট। দু একজন হাই-হ্যালো বলছে। আমরাও হাসিমুখে হাত নাড়াচ্ছি, হাই-হ্যালো বলছি। তীর্থ চলার মতো চাইনিজ বলতে পারে। আমার চাইনিজের যা তা অবস্থা। তীর্থ যতটুকু পারে তার থেকে ওর অঙ্গিভঙ্গি বেশি। কেউ যখন দেখছে তীর্থ চাইনিজে উত্তর দিচ্ছে তখন আগ বাড়িয়ে অনেকে কথা বলতে আসছে। অন্যান্য যাত্রীদের কেউ হয়তো এর পূর্বে কোনোদিন বিদেশী দেখেনি। দেখলেও লোকাল ট্রেনে একত্রে ভ্রমণ করেনি।

তীর্থ টুকটাক চাইনিজ বলতে পারলেও চাইনিজ ভাষায় ওর জ্ঞান একদম ভাসা ভাসা। কেউ যদি ওর সাথে কথা বলতে আসে সে ধরেই নিবে যে এই লোক ভালো চাইনিজ বলতে পারে। কিছুক্ষণ কথা বলার পর তীর্থের চাইনিজ দক্ষতার রহস্য উন্মোচিত হয়। তখন ওর স্বভাসূলভ হাসিই একমাত্র ভরসা। হাসি দিয়ে পাশ কাটিয়ে যায়। আমার সাথে দু একজন কথা বলতে চাইলে বলে দেই চাইনিজ না জানার কথা। হতাশ হয়ে সবাই ফিরে যায় তখন। আমার চাইনিজ না পারার কারণে হাসাহাসিও করে কেউ কেউ।

ট্রেনে খাবারের প্রচণ্ড দাম। খরচ এড়াতে অন্যান্য মালপত্রের সাথে বাড়তি খাবারের ব্যাগও নিয়ে উঠেছে সবাই। প্রত্যেকের সাথে একটা করে

খাবারের ব্যাগ। যেদিকে তাকাচ্ছি সবাই মুখ নাড়াচ্ছে। চাইনিজরা প্রচুর খায়। বাঙালিদের মতো একমাত্র ভাতের ওপরে এরা অভ্যস্ত না। দিনের নানা সময় নানা ধরণের খাবার খায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে কামড়া জুড়ে ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। সবাই ব্যাগ থেকে নুডুলস বের করে বসে আছে। ট্রেনের প্রতিটা বগিতে একটা করে খাবার পানির লাইন রয়েছে। সবাই ভিড় জমিয়েছে সেখান থেকে গরম পানি নেওয়ার জন্য। আমি এতদিন চীনে থাকলেও খাবারের অভ্যাস দেশের মতো রয়ে গিয়েছে। রাতের খাবার খেতে খেতে রাত দশটা বেজে যায়। চাইনিজরা অবশ্য রাতের খাবার সন্ধ্যার আগে খেতে অভ্যস্ত। তাছাড়াও নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেনের লোকজন খাবার নিয়ে আসে। আমাদের দেশের মতোই বিক্রির উদ্দেশ্যে খাবারের জন্য ডাকাডাকি করে। কিন্তু অধিকাংশ খাবার শেষ রাত অব্দি অবিক্রিত থেকে যায়। শেষদিকে সেই একই খাবার অর্ধেক দামে বিক্রি করে।

ধীর গতিতে ট্রেন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটে চলছে। চারপাশে অমাবশ্যার মতো অন্ধকার। অন্ধকার ভেদ করে সামনে আগাচ্ছি। ভ্রমণের সময় একটু একটু করে কমে আসছে। এখন অব্দি চাঁদ চোখে পড়েনি। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আকাশের তারাগুলো স্পষ্ট। হঠাৎ রোড লাইট দেখে বোঝা যায় ট্রেন কোনো অচেনা শহর অতিক্রম করছে।

বেশ কিছুক্ষণ হলো সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়েছে। ঘড়ি দেখে সময়ের খবর নিতে ইচ্ছে করছে না। আন্দাজ করতে পারছি রাত দুপুর হতে এখনও ঘণ্টা দুয়েক বাকি। শ খানেক যাত্রীর কামড়ায় সম্ভবত আমি একা জেগে আছি। অন্যান্য যাত্রীরা ঘুমোচ্ছো, কারো কোনো সারাশব্দ নেই। বাতিগুলো নিভিয়ে দিতে পারলে ভালো হতো। এমন আলোতে কারো ঘুম ঠিকঠাক হচ্ছে না। আমারও হবে বলে মনে হয় না। ঘুমের জন্যও অন্ধকার দরকার।

যাত্রার শুরুর দিকে হুমায়ূন আহমেদের বাঘবন্দী মিসির আলী পড়তে শুরু করেছি। বারবার চেষ্টা করেও পৃষ্ঠা আগাতে পারছি না। বইয়ের থেকে মনোযোগ অন্ধকারের দিকে ছুটে যাচ্ছে। এমন অন্ধকার আমার পছন্দ। আলোতে বসে অন্ধকার দেখায় কোনো আনন্দ নেই। অন্ধকার দেখতে হলে অন্ধকারে ডুবে থাকবে হবে। ইচ্ছে করছে অন্ধকারে ডুবে থাকতে। জানালায় কাঁচের দেয়াল না থাকলে ভালো হতো। বাতাস আসবে তারও কোনো ব্যবস্থা নেই। অন্ধকারও কেমন আবছা হয়ে আছে! এখানে আসার পর সেরা পাঁচ মিসির আলী বইটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলাম। পূর্বে যে বাঙালি সিনিয়ররা ছিল তাঁদের কেউ তীর্থকে বইটি দিয়েছে। দেশ থেকে আসার সময় তেমন কোনো বই সঙ্গে আনতে পারিনি। সংগ্রহে থাকা কাগজের চার-পাঁচটা বইয়ের মধ্যে এটিও একটি। এতদিন পড়বো পড়বো করে পড়া হয়নি। ভাবলাম এই যাত্রায় সেরা পাঁচ মিসির আলী সংকলনটি শেষ করবো। শেষ পর্যন্ত যা আর সম্ভব হয়নি।

রাতে কয়েকবার ঘুমানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। কামড়া জুড়ে এক ধরণের ভ্যাপসা গরম তৈরি হয়েছে। ট্রেনের ভেতরে বাতাস আসা যাওয়ার কোনো মাধ্যম নেই। এসি একমাত্র ভরসা। রাত বাড়ার সাথে কামড়ার তাপমাত্রা বেড়েছে। এতগুলো মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস এসির বাতাস দিয়ে সংকুলান হচ্ছে না। এমন পরিবেশে আমার ও তীর্থের কারোরই তেমন একটা ঘুম হয়নি। বাকিরা কীভাবে

ঘুমাচ্ছে বুঝতে পারছি না! একজন দেখলাম সিটের নিচে ঢুকে গিয়েছে। সিটে সুবিধা না করতে পেরে যাত্রীদের পায়ের নিচে চাঁদর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। খানিকটা অবাক হলেও পদ্ধতি মন্দ লাগেনি। ঘুমের প্রয়োজন হলে সেটা যে কোনো জায়গায়, যে কোনোভাবেই হতে পারে।

ট্রেনে আমাদের সিটগুলোও সুবিধার না। আরাম করে বসার উপায় নেই। সামনে পেছনে সরানোর উপায় নেই। চেয়ারের ফোমগুলো কেমন কাঠের মতো শক্ত হয়ে আছে। তীর্থ ভ্রমণের আগে সিটগুলো নিয়ে সতর্ক করেছিলো। আমি তখন গায়ে লাগাইনি। এই সিটে বসে বাকি অর্ধেক পথ কীভাবে যাবো তা নিয়ে চিন্তা হচ্ছে।

চোখে ঘুম কিন্তু ঘুমাতে পারছিলাম না। ঘুমানোর চেষ্টা করতে করতে রাত শেষ হয়ে এলো। যাত্রীদের অনেকের ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে। এতক্ষণের নিরবতা ভেঙে সবাই সরব হতে শুরু করেছে। সারারাতের ধকলের পর সকাল সকাল কিছুটা ক্লান্ত লাগছে। চোখের পাতা মেলে রাখতে পারছি না। কিন্তু ভ্যাপসা গরমে গলা ঘামানোর কারণে অস্থিরতা আরো বাড়ছে।

ঘুম ভাঙার পর চাইনিজরা সকালের নাস্তার তোরজোড় করছে। এদের সকলেরই সকাল সকাল ঘুমানোর অভ্যস। ঘুম থেকে উঠে দিনের জড়তা ভাঙতে একে অপরের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলছে। একটু যাও চোখ বুজি তাও এদের কথার শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। আমাদের সোজাসুজি একজন বৃদ্ধ মহিলা বসেছে যাঁর কাজ হচ্ছে তাঁর নাতির সাথে উচ্চস্বরে ঝাড়ি দেওয়া। ভিষণ দুষ্টু বাচ্চাটা ক্ষণিকের জন্য নিজের সিটে বসে থাকবে না। অন্যরা কে কি করছে তা নিয়ে ওর যত আগ্রহ। পাশের সিটে একটা ছেলে গেইম খেলছে । বুড়ির নাতির চোখ আপাতত গেইমের দিকে। একটু সময়ের মধ্যে ছেলেটার সাথে ভাবও জমিয়েছে। এখন দুজনে মিলে গেইম খেলছে। কিন্তু দাদীর তা সহ্য হচ্ছে না। উনি উঠে পরে লেগেছে নাতিকে সকালের খাবার খাওয়ানোর জন্য। বুড়ির চিল্লাচিল্লিতে কয়েকবার ঘুম ভেঙেছে আমাদের। প্রথম প্রথম বিরক্তি না আসলেও এখন বিরক্ত লাগছে। কয়েকবার চোখ বড় বড় করে বিরক্তিভাব নিয়ে তাকিয়েছি। কিন্তু মহিলা কোনো গুরত্বই দিলো না। এই জার্নিতে যে ঘুমের সুযোগ হবে না তা মোটামুটি নিশ্চিত।

চারপাশ স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। সকাল সকাল সূর্যের প্রখর আলো চোখে পড়লে বিরক্ত লাগে। জানালার পর্দা টেনে দিলাম। কিছুক্ষণ পর ট্রেন বাক নেওয়ার ফলে এখন সূর্যের বিপরীত দিকে আমাদের অবস্থান। পর্দা সরিয়ে দিতেই মনে হলো চারধারে স্বর্গ নেমে এসেছে। স্বর্গের মাঝখান দিয়ে আমাদের ট্রেন ছুটছে। দুপাশে ঘন সবুজ বন। পাহাড়ের ঘা ঘেঁষে দু চারটা ঘর দেখে মনে হচ্ছে মানুষের পদচারনা আছে।

মুগ্ধ হয়ে চারপাশ দেখছি। চোখের ঘুম কোথায় চলে গিয়ে টেরও পাইনি। মোবাইল বের করে ছবি তুলবো তাও ইচ্ছা হলো না। এমন নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য রেকর্ড করতে নেই। কিছু দৃশ্য মস্তিষ্কে গেঁথে নেওয়া উত্তম। হঠাৎ অন্ধকার কোথাও দেখে মনে হলো এই বোধহয় পাহারের বুক চিরে আমরা চলছি। টানেলের চারপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। টানেল অতিক্রম করে হঠাৎ চোখে আলোর ঝলকানি পড়লে মনে হয় কোনো অন্ধ এই বুঝি তার দেখার ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে। চোখ তুলে তাকাতেও তখন কষ্ট হয়। সকাল পেরিয়ে দুপুর হলো। যাত্রীরা যে

যার মতো খাবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে আমি ঘণ্টা তিনেক ঘুমানোর সুযোগ পেয়েছি। এখন পিঠের ব্যাথায় নড়তে পারছি না। এই জঘন্য সিটে আর কোনোদিন ভ্রমণ করবো না বলে তওবা করলাম। আমরা যে খাবার নিয়ে এসেছিলাম তা গত বিশ ঘণ্টার জার্নিতে শেষ হয়ে গিয়েছে। চারপাশে সবাই খাচ্ছে কিন্তু আমরা চুপ করে বসে আছি। ব্যাপারটা আমাদের তো ভালোলাগছেই না অন্যরাও কেমন করে তাকাচ্ছে। পেটেও বেশ ক্ষুধা টের পাচ্ছি। ট্রেনে যে খাবার দেখেছি তা পছন্দ হয়নি। চড়া দাম দেখে কেনার আগ্রহ চলে গিয়েছে। সকালে কফি ও রুটি খাওয়ার পর থেকে এখন অব্দি কিছু খাইনি। তীর্থকে বললাম– খাবারের দাম বেশি হলেও কিছু একটা কিনে আনতে। বিকেলের দিকে ওদের সব খাবার শেষ হয়ে গিয়েছে। ভাতের সাথে সবজি ও মুরগির কিছু একটা পেলাম। খাবারে নির্দিষ্ট কোনা নাম জানতে পারিনি। খাবারের হাজার ধরণের মাঝে চাইনিজ নাম মুখস্থ করাও কষ্টসাধ্য।

ট্রেনের সবথেকে আকর্ষনীয় জায়গা হলো স্মোকিং কর্ণার। ধীর গতির এসব লোকাল ট্রেনেই শুধু স্মোকিং জোন আছে। দুই বগির মাঝখানে টয়লেটের পাশ দিয়ে এই স্মোকিং কর্ণার। আমার সিগারেট ফোকার অভ্যাস নেই। কালেভদ্রে বন্ধুদের সাথে দু এক টান দিলেও দিতে পারি। প্রথম সিগারেট মুখে নিয়েছিলাম গত বছর। এই এক বছরে মোট চার-পাঁচ বারের বেশি সিগারেট ফুঁকেছি বলে মনে পড়ে না। তীর্থও আমার মতো। কেউেই নিয়মিত স্মোক করি না। স্মোকিং কর্ণারে জটলা দেখে একটু আগ্রহ জন্মিয়েছে। আমি ও তীর্থ গিয়ে সেই জটলায় ঘি ঢেলেছি। লোকজন এখন আমাদের নিয়ে ব্যস্ত। এক লোক নিজ হাতে পাতার সিগারেট বানিয়ে খাচ্ছে। সে বাজারের সিগারেট খেতে অভ্যস্ত না, নিজ হাতে সিগারেট বানিয়ে খায়। তীর্থকে জিজ্ঞেস করতে বললাম উনি কী করেন। বৃদ্ধ জানালো সে গ্রামের বাড়িতে কৃষিকাজ করেন। শহরে গিয়েছিল তাঁর উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে। বৃদ্ধের পাশাপাশি আমাদের দেখে সবার আগ্রহ বেশ তুঙ্গে। কামড়ার ডিউটিরত অফিসার এসে দেখে গেলো এখানে কি হচ্ছে। কে কোনো ভ্রুক্ষেপ করেছি। আমি চাচার থেকে তার পাতার সিগারেট বানানো শিখলাম এবং ভিডিও করলাম। আমাকে তাঁর বানানো একটা সিগারেট উপহার দিয়েছে। কিন্তু শর্ত ছিলো তার সামনে টানতে হবে। আমি সহ বাকি চার-পাঁচজনের সবাই একসঙ্গে সঙ্গে পাতার সিগারেট ফুঁকলাম।

শেনইয়াং পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত এগারোটা বেজেছে। এই দীর্ঘ সাতাশ ঘণ্টার জার্নিতে ট্রেন কোথাও এক মিনিট দেরি করেনি। টিকেটে যে সময় উল্লেখ ছিলো বরং তাঁর মিনিট পাঁচেক আগেই শেনইয়াং রেল স্টেশনে পৌঁছেছি। ট্যাক্সি ঠিক করে হোটেল যেতে যেতে শহরটাও একটু দেখলাম। শিয়ানের মতো এখানকার রাস্তাঘাট অতটা সাজানো গোছানো মনে হয়নি। হোটেলের চেক ইন শেষ করে নির্ধারিত রুমে এসে দুজনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি। কোনো বিরতি না নিয়ে দীর্ঘ সময়ের ভ্রমণে এই ধীর গতির ট্রেনে আর চড়া যাবে না। সমস্ত শরীর জুড়ে ব্যথা টের পাচ্ছি। ব্যাথানাশক কোনো ওষুধও সঙ্গে আনিনি। লম্বা ঘুম দিলে আশাকরি ঠিক হয়ে যাবে।ক্ষুধায় পেট চৈ চৈ করছে। সারাদিনে বিকেলে একবার মাত্র খেয়েছি। নাওয়া শেষ করে এবার আমরা খাওয়ার জন্য বের হলাম। আশেপাশে বেশ কতক্ষণ ঘোরাঘুরি করে কোনো খাবারের দোকান পাচ্ছিলাম না। রাত দুপরে কোনো রেস্টুরেন্ট খোলা পাবো সে সম্ভাবনাও নেই। আশেপাশে দু একটা ক্লাব দেখেছি। কিন্তু ক্লাবে গেলে তো পেট ভরবে না। ভরপেট না খেতে পারলে রাতে

ঘুম হবে না। রাস্তায় কতগুলো নুডুলসের দোকান পেয়েছি। কিন্তু খালি পেটে ভ্যান থেকে নুডুলস খাওয়ার রিস্ক নিতে চাচ্ছি না। রাস্তার ভ্যানের এ খাবারগুলো রাত তিনটা পর্যন্ত খোলা পাওয়া যায়। আমাদের মতো ঠেকে পরা মানুষজন রাত-বিরাতে খেতে আসে। পূর্বে যতবার খেয়েছি ততবারই বদহজম হয়েছে। বাড়তি তেল ও মরিচের কারণে পেটে জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে যায়। অনেকক্ষণ খোঁজাখুজির পর পাশাপাশি দুটো দোকান খোলা পেলাম। একটা বারবিকিউ শপ ও অন্যটা মাওছাইয়ের দোকান। মন চাইছে মাছ, মাংস, সবজি দিয়ে ভাত খেতে। এই দূর দেশে এসব কোথায় পাবো! বারবিকিউয়ের দোকানে কেবল চাইনিজ বিয়ার ও বারবিকিউ আইটেম ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না। মাওছাইয়ের দোকানে ভাত পাওয়া যেতে পারে। শিচুয়ান প্রদেশের এই বিখ্যাত খাবারটি আমাদের দুজনারই পছন্দের। দোকানে ঢোকার পর কোনো কাস্টমার দেখতে পেলাম না। তবে দোকানি খাবার প্রস্তুত করতে ভিষণ ব্যস্ত। বোঝা গেলা অনলাইনে প্রচুর অর্ডার আসছে। আমরা এক কোনায় গিয়ে বসলাম।

এমন জিনিস নাই যা মাওছাইয়ে থাকে না। শাকসবজি, মুরগি, সসেজ, ডিম, শূকরের মাংস সবকিছুর অদ্ভূত মিশ্রনে এই খাবার। বড় ডালায় সব উপাদানগুলো সাজানো থাকে। নিজের ইচ্ছামতো নিয়ে নেওয়া যায়। সবজির সাথে স্মোকি সসেজটা আমার খুব পছন্দ। দোকানদারকে আগেই ভাতের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। রাত বেশি হওয়াতে ভাত নেই বলে জানালো। তাই নুডুলস নিলাম। সাধারণত মাওছাইয়ের সাথে আমার নুডুলস পছন্দ না। পেট ভরতে হলে আপাতত নডুলস ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। পেটের ক্ষুধায় মনে হচ্ছে দোকানের সব খেয়ে ফেলতে পারবো।

অনেকটা তৃপ্তি নিয়ে খাবার খেয়েছি। এত ভালো স্বাদের মাওছাই এখন অব্দি কোথায় খাইনি। এই মাওছাইয়ের জন্য হলেও শেনইয়াং আরেকবার আসতে হবে। ক্লান্ত শরীর নিয়ে রাতে ঘুমাতে দেরি করিনি। পরের একটা দিন আমাদের হাতে রয়েছে। তীর্থের ভিসা ইন্টারভিউয়ের আগে এই ছোট্ট শহরটা টুকটাক ঘুরে দেখার পরিকল্পনা।

পরেরদিন শেনইয়াং ক্যাথলিক কমিউনিটি চার্চ, মুকদান প্যালেস এবং ডাউনটাউন এলাকা ঘুরে সন্ধ্যার আগেই হোটেলে ফিরলাম। তীর্থের ভিসার ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে। সকাল সকাল কনস্যুলেট অফিসে থাকতে হবে ওকে। সেজন্য তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল সকাল প্রস্তুত হয়ে দুজনে বের হয়েছি। তীর্থ ইন্টারভিউয়ের জন্য ভেতরে গেলে ওর ব্যাগপত্র আমাকে রাখতে হবে। ঘণ্টা দেড়েক ওর জন্য অপেক্ষা করছি। ভিসা পেলে দুজনে আনন্দে ঘরে ফিরবো সেই অপেক্ষাই করছিলাম। কিন্তু ওর ভিসা ইন্টারভিউ অভিজ্ঞতা খুব বাজে হয়েছে। ভিসা অফিসার তেমন কোনো প্রশ্ন না করেই রিজেক্ট করে দিয়েছে। ছেলেটার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। বড় স্বপ্ন নিয়ে এত দূর থেকে এখানে এসেছে কিন্তু ফিরতে হবে বিষন্নতা নিয়ে। হোটেলে ফেরার পথে তীর্থকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। আমারও ওর জন্য খারাপ লাগতে শুরু করলো। বারোটার আগে হোটেল খালি করতে হবে। নয়তো অতিরিক্ত ভাড়া গুণতে হবে। ট্যাক্সিতে কেউ কারো সাথে

তেমন কথা বলিনি। তীর্থের মন খারাপের কাছে আমার নিজেরও অসহায় লাগছে।

ভিসার কাজবাজ শেষ হওয়ার পরবর্তী পরিকল্পনা ছিলো বেইজিং ঘুরতে যাওয়া। মন খারাপের সময়ে তীর্থকে ঘোরাঘুরির কথা বলতে ইচ্ছে হলো না। বরং তীর্থ কী বলে তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ঘণ্টা দুয়েক পর তীর্থ কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। শিয়ানে ফিরতে হলে আমাদেরকে আজই ট্রেন ধরতে হবে। যেইদিনের ট্রেনের টিকিট সেইদিন পাওয়াও একটা ঝামেলা। হোটেল থেকে বেরিয়ে তাই সরাসরি স্টেশনে চলে গেলাম। অনলাইনে টিকিট না পেলেও সরাসরি পেতে পারি সেই ভরসায়। টিকিট কাটতে গিয়ে বাঁধলো আরেক বিপত্তি। যেই অফিসার আমাদের টিকিট কাটবেন তিনি কম্পিউটারের সিস্টেমে বিদেশীদের কোনো অপশন খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পরে অন্য এক অফিসার আমাদের টিকিটের ব্যবস্থা করে দিলেন। পাঁচ মিনিটের কাজে মহিলা আমাদের ঘণ্ঠাখানেক সময় ব্যয় করেছে। পেছনে অন্যন্য যাত্রীরা বিরক্ত হচ্ছিলো। দেরি দেখে লাইন পরিবর্তন করে অন্যন্য লাইনে চলে গিয়েছে। শেষমেশ বেইজিংয়ের টিকিট পেলাম। বেইজিং পৌঁছে ফের শিয়ানের টিকিট কাটতে হবে। ট্রেন ছাড়তে রাত দশটা বাজবে। দুপুরের পর থেকে স্টেশনে বসে আছি। খাওয়া দাওয়া করে স্টেশনের ওয়েটিংয়ে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি। তীর্থ ফাঁকে নতুন ভিসা অ্যাপয়েনমেন্টের চেষ্টা করছে। নতুন ভিসা অ্যাপয়েনমেন্ট পাওয়ার পর কিছুটা স্থির হয়েছে।

পরেরদিন সকালে বেইজিংয়ে পৌঁছাবো। ট্রেনের সময়সূচীতে শিয়ানগামী পরবর্তী ট্রেন রাত এগারোটায়। সারাদিন বেইজিং কাটানোর একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। তীর্থকে তখনও ঘোরাঘুরির কথা বলিনি। কিছুক্ষণ পর তীর্থই বললো– ভাই, বেইজিংয়ে সারাদিন কী করবেন? আমি তখন আগ বাড়িয়ে মহাপ্রাচীরের কথা বললাম। সেও রাজি হলো। সারাদিন স্টেশনে বসে থাকার থেকে যতটুকু পারি ঘোরাঘুরি করি সেটাই বরং ভালো হবে। ঘোরাঘুরিতে এমন সমমনা ভ্রমণ সঙ্গী হলে ভ্রমণ আরো সুন্দর হয়ে ওঠে। তীর্থের চোখে মুখে ভিসা না হওয়ার সংকট আপাতত আর দেখতে পাচ্ছি না। আগের থেকে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

শেনইয়াং থেকে বেইজিংয়ের মাঝখানে সাংহাইকুয়ান নামের একটা স্টেশনে আমাদের ট্রেন বদলাতে হবে। সেখানেও তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। ট্রেনের অফিসারকে আগেই বলে রেখেছিলাম সাংহাইকুয়ান পৌঁছানোর আগে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে। পৌঁছানোর মিনিট বিশেক পূর্বে উনি আমাদের ডেকে দিয়েছেন। ঝরঝরা ইংরেজিতে আমাদের সাথে কথা বলেছেন। সাংহাইকুয়ানে যেহেতু তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে তাই তিনি পরামর্শ দিলেন যাতে এখানে গ্রেট ওয়াল দেখে যাই। আমাদের ধারণা ছিল না এখান থেকেও মহাপ্রাচীর দেখা যাবে। গত রাতে ট্রেনে বসে একজন চাইনিজ মেয়ের সাথে আমাদের পরিচয় হয়। মেয়েটিও জানালো স্টেশন থেকে কাছেই গ্রেটওয়াল। হাতে সময় থাকলে গ্রেট ওয়ালের পাশপাশি সমুদ্র সৈকতও যাতে ঘুরে আসি। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আমরা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলাম। সাংহাইকুয়ানে সময় ব্যয় না করে বরং বেইজিংয়ে গ্রেট ওয়াল দেখবো সেই সিদ্ধান্ত নিলাম।

সাংহাইকুয়ানে ঘণ্টাখানেক সময় স্টেশনের বাইরে কাটিয়েছি। পাশেই একটি বাজার। সকাল সকাল তাজা সবজি ও ফলের ভ্যানগুলো আসতে শুরু করেছে। এখানকার মানুষগুলো বেশ আন্তরিক। নিজ থেকে এসে আমাদের খোঁজ খবর নিয়েছে। কোথায় গেলে কীভাবে সবকিছু দেখতে সুবিধা হবে সেই তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছে। সবার মুখে এক ধরণের মায়া দেখতে পেয়েছি। সাংহাইকুয়ানের আবহ অনেকটা দার্জিলিংয়ের মতো। পাহাড়ের ওপরে ছোট্ট একটা মেঘাচ্ছন্ন শহর। এক চাচার থেকে সদ্য গাছ থেকে তোলা কেজি খানেক পিচ ফল কিনলাম। স্বাদে ছিল অতুলনীয়। বিদেশী দেখে আমাদের থেকে দামও কম রেখেছে।

আগেরদিন আমরা কেউ গোসল করিনি। মাথা ব্যথার পাশাপাশি সারারাতের ট্রেন জার্নিতে গা থেকে উৎকট গন্ধ বের হতে শুরু করেছে। বেইজিং পৌঁছে প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে গোসল করা। শুধু গোসলের জন্য হোটেল ভাড়া করার তো মানে হয় না। ঢাকায় যেমন কমলাপুর রেল স্টেশনে দশ টাকা দিয়ে গোসল করা যায় ওরকম কিছু খুঁজে পেলে ভালো হতো। স্টেশনের পাশে একটা পাবলিক ওয়াশরুমে বিরতি নিলাম। কিন্তু গোসল করার সুযোগ ছিল না। চুল শ্যাম্পু করা থেকে শুরু করে হাত পা মোছা সবকিছুই ওয়াশরুমের বেসিনে করেছি। আমাদের কাণ্ড দেখে চাইনিজরা ভড়কে গেছে। নিশ্চয়ই ভেবেছে এরা আবার কোত্থেকে আসলো!

বাসি জামাকাপড় পরিবর্তন করার পর কিছুটা স্বস্তি লাগছে। সারাদিন চলতে পারবো বলে শরীরের জোর পেয়েছি। কিন্তু কীভাবে কি মহাপ্রাচীরে যাবো তখনও তা অনিশ্চিত। কাউকে জিজ্ঞেস করবো তারও উপায় নেই। কেউ বুঝবে না আমাদের কথা। ইন্টারনেট ঘেটেঘুটে বের করলাম মহাপ্রাচীরে যাওয়ার রাস্তাঘাট। বেইজিং শহর থেকে কাছাকাছি কয়েকটি জায়গা রয়েছে যেখান থেকে মহাপ্রাচীর দেখা যায়। তবে ভ্রমণের জন্য সবথেকে ভালো জায়গা বাদালিং। কিন্তু বাদালিং যেতে হলে বাসে করে প্রায় দুই ঘণ্টা জার্নি করতে হবে। আমাদের হাতে যেহেতু রাত এগারোটা অব্দি সময় আছে তাই তেমন একটা দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। বাদালিং যাওয়ার উদ্দেশ্যে সাবওয়েতে তিশেংমেন স্টেশনে গিয়ে পৌঁছালাম। ওখান থেকে নয়শো উনিশ নম্বর বাসে করে বাদালিং যেতে হবে। কিন্তু বিপত্তি ঘটালো বৃষ্টি। কারো সাথেই ছাতা নেই। ভিজে জুবুথুব হয়ে বাসে উঠতে হয়েছে।

তিশেংমেন যাত্রাপথে কোরিয়ান সহযাত্রী লিও ও তাঁর পরিবারের সাথে পরিচয় হয়। লিও চায়নাতে থাকে গত তেরো বছর ধরে। এখানেই বিয়ে করেছে। দুই সন্তান সহ এবার প্রথম সে মহাপ্রাচীর দেখতে এসেছে। লিও কোরিয়ানের পাশাপাশি চাইনিজ এবং ইংলিশ দুটোই বলতে পারে। আমাদের সহযাত্রী হিসেবে লিও যুক্ত হওয়ার কারণে বাদালিং পর্যন্ত যেতে আর কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি। যদিও বাদালিং যাওয়ার পর লিওয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। পরবর্তীতে যে যাঁর মতো করে ঘুরেছি। আর দেখা হয়নি কখনো।

দুইঘণ্টার ভ্রমণে বাস ভাড়া মাত্র দুই ইউয়ান। চীনের বাস ভাড়ার এই নিয়মটা একটু অদ্ভুত। বাসে ওঠা মাত্র মোবাইলের মাধ্যমে টাকা দিতে হয়। বাসের রুট অনুযায়ী বাসের ভাড়া কমতে ও বাড়তে পারে। তবে সব জায়গার যাত্রীদের জন্য একই ভাড়া। যিনি

বাদালিং যাবে তার জন্য দুই ইওয়ান এবং যিনি মাত্র উঠে মিনিট পাঁচেক পর নেমে যাবেন তাকেও একই ভাড়া গুণতে হবে। আমাদের উইচ্যাটে সমস্যা হওয়াতে ভাড়া দিতে পারিনি। ড্রাইভারকে বলে বসে পড়েছি। বিদেশী দেখে উনিও আর ঝামেলা বাড়ায়নি।

বেইজিং শহর অতিক্রম করতেই দুই পাশে পাহাড়গুলো আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে শুরু করেছে। ঘন কুয়াশার চাঁদর পেরিয়ে আমাদের বাস বাদালিংয়ের দিকে আগাচ্ছে। পাহাড়ের ঢালে মহাসড়কগুলো মুগ্ধ হওয়ার মতো। পাহাড়ের ঘন, সবুজ জঙ্গলের মাঝ দিয়ে কোথাও কোথাও বৌদ্ধ মন্দিরের ছাউনি দেখা যাচ্ছে। মন্দিরগুলো ছাড়া আর কোনো ঘরবাড়ি চোখে পড়লো না। জনপদহীন পাহাড়ে মন্দিরগুলো শত শত বছর আগে তৈরি হয়েছে। এগুলোকে কেন্দ্র করেই সমগ্র চীন ব্যাপী বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটেছিলো। বৃষ্টি ততক্ষণে কমে গিয়েছে। চারপাশ এখন কিছুটা স্পষ্ট। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আমরা একটু একটু করে উপরে উঠছি।

বাদালিং যাত্রার মাঝখানে ঘণ্টা খানেক ঘুমিয়েছি। ক্লান্তির কারণে ভালো ঘুম হয়েছে। কোনো সাড়াশব্দ পাইনি। পাহাড়ের সীমানা তখনও শেষ হয়নি। চারপাশে যেন কুয়াশার চাদর বিছিয়ে রেখেছে! বাস থেকে নামতেই গা ভিজে যাচ্ছিলো। প্রথমে বৃষ্টি মনে হলেও ওগুলো মূলোতো বৃষ্টিকণা ছিল না। পাহাড়ের শিখরে থাকার কারণে আমাদের অবস্থান তখন মেঘের সমুদ্রে। কুয়াশার মতো মেঘ গায়ে লাগতেই গলে যাচ্ছিলো।

বাস থেকে নামার পর মেঘের কারণে একটু দূরের মানুষও ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছিলাম না। ওদিকে মেঘের শিশিরে গা ভিজে যাচ্ছে। এই সুযোগে কয়েকজন হকার চলে এসেছে রেইনকোট নিয়ে। দরদাম করে অর্ধেক দামে দুইজনার জন্য দুইটা রেইনকোট কিনলাম। চাইনিজরা কেউ ভারী ব্যাগ নিয়ে আসেনি। কিন্তু আমাদের কাঁধে দুজনার ভারী ব্যাগ। ল্যাপটপ, জামাকাপড় সব ব্যাগের মধ্যে। এই ব্যাগ নিয়ে পাহাড়ে উঠবো কী করে সেই চিন্তা হচ্ছে। ব্যাগ জমা রাখার জন্য অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলাম কিন্তু পেলাম না। কিছুদূর পাহাড় বেঁয়ে ওঠার পর একটা মার্কেট পেলাম। পর্যটকদের ভিড়ে এলাকা গমগম করছে। কয়েকজন দোকানিকে অনুরোধ করেছি ব্যাগ রাখার জন্য। কেউ রাজি হয়নি। অনেক খোঁজখুজি করেও ব্যাগ রাখার কোনো জায়গা পাইনি। কেউ একজন বললো মহাপ্রাচীরে ওঠার গেইটে ফ্রি ব্যাগ রাখার জায়গা আছে। পুলিশ ওখানে পর্যটকদের ব্যাগের পাহাড়া দেয়। সেই জায়গাও খুঁজে পেতে বেগ পেতে হয়েছে।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আমরা মহাপ্রাচীরের দিকে আগাচ্ছি। কিছুদূর যেতেই ব্যাগ রাখার জায়গা খুঁজে পেলাম। মহাপ্রাচীরের প্রধান প্রবেশদ্বারে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় বিকেল চারটা বেজেছে। পাঁচটার মধ্যে ব্যাগ ফেরত নিতে হবে। নয়তো স্টোরটি ততক্ষণে বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যাগ নিয়ে ওঠাও সম্ভব না। ব্যাগ জমা রেখে আবার এত অল্প সময় প্রাচীর দেখে মন ভরবে না। এসব দ্বিধাদ্বন্দে ইতোমধ্যে আরো কিছুক্ষণ কেটে গিয়েছে। এত দূর থেকে এসে মাত্র পৌনে এক ঘণ্টার জন্য মহাপ্রাচীর দেখবো সেই উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই এখানে আসিনি। ব্যাগ রাখবো কি রাখবো না সেই সিদ্ধান্ত নিতে নিতে আরো খানিকক্ষণ চলে গেলো। শেষমেশ ব্যাগ জমা দিয়ে

মহাপ্রাচীরে ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই অল্প সময়ে যতটুকু পারি ততটুকুই দেখবো। এছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না।

গ্রেট ওয়ালে উঠতে হলে জনপ্রতি চল্লিশ ইউয়ানের টিকিট কাটতে হয়। বিদেশীদের জন্য ডকুমেন্ট হিসেবে পাশাপাশি পাসপোর্ট দেখানো বাধ্যতামূলক। ছাত্রদের জন্য অর্ধেক ছাড়ের ব্যবস্থা আছে। আমরা দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডি কার্ড নিয়ে গিয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আইডি কার্ড এই প্রথম কোনো কাজে লাগছে। কার্ড দেখানোর পর তীর্থ ডিসকাউন্টের সুবিধা পেলেও আমি পাইনি। পঁচিশ বছর পরবর্তী কারো আইডি কার্ড থাকলেও তাকে সম্পূর্ণ ফি দিতে হবে। সে আর ছাত্র বলে বিবেচিত হবে না। একটু জোরাজুরি করবো সে উপায়ও নেই। আমাদের কোনো কথাই ওরা বুঝবে বলে মনে হয় না। নিয়ম অনুযায়ী টিকিট সংগ্রহ করে মহাপ্রাচীরে পা রেখেছি। ক্যাবল কার দিয়েও প্রাচীর ঘুরে দেখার সুযোগ ছিলো। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা হেঁটে হেঁটে মহাপ্রাচীর দেখার। সময় স্বল্পতাও ছিলো অন্যতম কারণ। একটা সম্পূর্ণ দিন যদি মহাপ্রাচীরে সময় দেওয়া যেত তবে খানিকটা অংশ ঘুরে দেখা সম্ভব হতো। এত স্বল্প সময়ে বিশ হাজার কিলোমিটারের দীর্ঘ প্রাচীরের কতটুকু-ই-বা দেখা সম্ভব।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঁচুপথে হাঁটতে হাঁটতে বুকের মধ্যে আলাদা অনুভূতি টের পেলাম। যে মহাপ্রাচীরকে আমি স্বপ্নে দেখতাম সেখানটাতে এখন দাঁড়িয়ে আছি! কেমন এক অবিশ্বাস কাজ করেছে। এখানে আসার আগে মহাপ্রাচীরের অনেক ছবি দেখেছি। কোথাও এত সুন্দর দৃশ্য দেখিনি। আমার অভিজ্ঞতা অনেকটাই আলাদা। এমন মেঘাচ্ছন্ন মহাপ্রাচীর দেখার সৌভাগ্য কজনার হয়! মহাপ্রাচীরের উপরের অংশে মেঘগুলো হালকা হতে শুরু করেছে। নিচের মতো গা ভিজিয়ে দিচ্ছে না। মনে হচ্ছে আমরাও মেঘের সাথে লেগে আছি। ঘন কুয়াশার মতো মেঘের মাঝে মহাপ্রাচীর যেন দাঁড়িয়ে আছে কালের স্বাক্ষী হয়ে।

পৃথিবীর অন্যতম সপ্তাশ্চর্য গ্রেট ওয়াল অব চায়নার উঁচু নিচু পথ পেরিয়ে বেশ খানিকটা পথ সামনে এগিয়েছি। বিস্ময়ে যেন কমছেই না। যত সামনে আগাচ্ছি ততই মুগ্ধতা বাড়ছে। চারদিকে নিসর্গের মাঝে বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর দীর্ঘতম এই স্থাপনা।

আমাদের মতো আরো অনেক পর্যটক মহাপ্রাচীর ভ্রমণে এসেছে। সবার চোখেমুখে এক ধরণের বিস্ময় লেগে আছে। কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না যে এ-ও কী করে সম্ভব! উঁচু পাহাড়ের ওপর এই জটিল স্থাপনা কীভাবে বানানো সম্ভব হয়েছে তা এক রহস্য বটে। কিছুদূর পর পর পর্যবেক্ষণ টাওয়ারগুলো মহাপ্রাচীরের সৌন্দর্য বহুগুনে বাড়িয়েছে। দীর্ঘ বিরতিতে রয়েছে প্রশাসনিক ও সেনাঘাটির টাওয়ারগুলোর অবস্থান। এসব পর্যবেক্ষণ টাওয়ার থেকে চাইনিজরা দস্যুদের ওপর নজর রাখতো। অস্ত্র ও খাদ্য ভাণ্ডার হিসেবেও ব্যবহৃত হত এসব নিরাপত্তা চৌকিগুলো। আমরা খুটিয়ে খুটিয়ে পর্যবেক্ষণ চৌকিগুলো দেখলাম।

চাইনিজদের সভ্যতা প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো। দুই হাজার বছরের পুরোনো এই স্থাপনা এখনও বহাল তবিয়তে টিকে আছে। চাইনিজরা মহাপ্রাচীরকে ওয়ানলি ছাঙছাঙ নামে ডাকে যাঁর

আভিধানিক অর্থ হচ্ছে দীর্ঘতম দেয়াল। পাহাড় কেটে পাথর খণ্ড ও পোড়ামাটির ইট দিয়ে তৈরি এই মহাপ্রাচীর। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন দিতে হয়েছে পৃথিবীর এই প্রাচীনতম জনপদটিকে রক্ষা করার জন্য। যাঁদের ইতিহাসে কোনো স্থান না হলেও তাদের সৃষ্টি ঠিকই ইতিহাস হয়ে টিকে আছে।

আমাদের সময়ের দিকেও বারবার খেয়াল রাখতে হচ্ছে। পাঁচটার আগে ব্যাগ না নিতে পারলে সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে। মহাপ্রাচীরকে যেভাবে উপভোগ করা দরকার তা পারছিলাম না। এক ধরণের তাড়াহুড়ো কাজ করেছে। আমি বারবার ভাবছিলাম মহাপ্রাচীরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার কথা। প্রাচীরের ওপর দিয়ে হেঁটে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে পারলে নিশ্চয়ই তা আনন্দের হত। অথচ আমরা সর্বসাকুল্যে মোট সময় পেয়েছি মাত্র পয়তাল্লিশ মিনিট।

বিদেশীদের প্রতি চাইনিজ পর্যটকদের এক ধরণের আকর্ষণ রয়েছে। আমরা অনেকের সাথে ছবি তুলে তাঁদের আবদার পূরণ করলাম। ভেবেছিলাম দেশের পতাকা সহ ছবি তুলবো। কিন্তু তাড়াহুড়োর কারণে ব্যাগ থেকে পতাকা আনতেই ভুলে গিয়েছি! ওদিকে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই ব্যাগের স্টোররুম থেকে ফোনকল এসেছে। ওনারা বন্ধ করে চলে যাবে। আমরা যাতে দ্রুত ব্যাগগুলো নিয়ে যাই। শেষ বারের মতো মহাপ্রাচীর দেখে নিলাম। মেঘে ঢাকা মহাপ্রাচীর যেন আমাকে টেনে রাখছে। ওখানে থাকলেই যেন আমি খুশি হতাম। দেখার মধ্যেও না দেখার বাসনা জায়গার প্রতি এক ধরণের টান সৃষ্টি করে। আমিও এক অদ্ভূত ভালোবাসা টের পেলাম। মনে হচ্ছে– আবার কোনোদিন মহাপ্রাচীরে আসতে হবে। আরো বেশি সময় নিয়ে মহাপ্রাচীরের বিশালতা উপভোগ করতে হবে।

কতকিছু দেখিনি, কতকিছু দেখা বাকি রয়ে গিয়েছে। এক অপূর্ণতা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নিচে নামলাম। ব্যাগপত্র নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। বাদালিংয়ের পাহাড় লাগোয়া বাজারটি ঘুরে সেখানকার কিছু বিখ্যাত খাবার খেলাম। বরাবরের মতো এবারও খাবারের নাম জানা হয়নি। ইতোমধ্যে বেইজিংগামী শেষ বাসটি ছেড়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তাড়াহুড়ো করে বাসে উঠলাম। গোধূলি বেলায় এক ধরণের বিষন্নতা নিয়ে বাসের পেছনের সিটে চেপে বসেছি। বাস একটু একটু করে বেইজিংয়ের উদ্দেশ্যে আগাচ্ছে। মহাপ্রাচীর দেখার অপূর্ণতা যেন আমাকে চেপে ধরেছে। কয়েকদিনের ক্লান্তিকর ঘুমে আমি আচ্ছন্ন। বারবার চোখে ভাসছে মেঘে ঢাকা মহাপ্রাচীরকে।

মোঃ ফোরকান

মাস্টার্স শিক্ষার্থী,

শিদিয়ান ইউনিভার্সিটি, শিয়ান, শানশি, চীন।

Sports Day

Since my childhood, I have studied in a very reputed English medium school but never had a sports day so colorful, vibrant, and energetic as the one I have experienced on the campus of Harbin Medical University.

In 2012, my friends and classmates asked me to participate in the 5000-meter race. As I have a hobby of running and playing football. My friends helped me a lot during my practice sessions. We also had to prepare for Tai Chi,

"Tai chi is an internal Chinese martial art practiced for self-defense and health. Known for its slow, intentional movements, tai chi has practitioners worldwide and is particularly popular as a form of gentle exercise and moving meditation, with benefits to mental and physical health."

The next day was my race, around 4-5 friends of mine kept running outside the track to keep me running and motivated. Though most of them didn't belong to my motherland their friendship and brotherhood were beyond the borders. At the very end of our race when I had more than 1000/1200 meters to go, I felt like quitting.

My friend said loudly, "We are not here to see you win but rather to support you so that you don't quit. So, keep moving and always remember, finishing the race of 5000 meters is the like race of our life where we never quit rather, we just keep moving ahead maybe slowly but always move forward."

It's been over 11+ years since that day but the lines still echo in my ears and help me a lot to face the challenges of my life.

Dr. Toukir Hossain Memo

Harbin Medical Unversity, Harbin, China.

প্রবাসে বিজয়, বায়ান্ন

হেনান বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর, রক্তস্নাত বিজয়ের ৫২তম বার্ষিকী। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মাথা উচু করার দিন। স্বাধীনতাকামী বাঙালির হৃদয়ে মাসটি মহানন্দের, মহা-গৌরবের। স্বজন হারানোর বেদনায় এই মাস একইসঙ্গে শোকের, আবার উদ্‌যাপনেরও।দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র সংগ্রাম করে বহু প্রাণ আর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এদিনে বীর বাঙালি ছিনিয়ে আনে বিজয়ের লাল সূর্য। পৃথিবীর সব স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা দিবস থাকলেও বিজয় দিবস পালন করা হয়না। বাংলাদেশ সেই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী দেশ,তাই এই দিনটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ন। এই বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র বাংলাদেশী শিক্ষক ড. মো: আশরাফুল আলম সহযোগী অধ্যাপক, ঝেংঝু বিশ্ববিদ্যালয়, অতিথি হিসাবে আরো উপস্থিত ছিলেন- আবুল কালাম আজাদ ফাউন্ডার রয়েল নার্সিংকলেজ গাজীপুর, মোঃ শরিফুল ইসলাম পিএইচডি গবেষক ঝেংঝো বিশ্ববিদ্যালয় আরোও উপস্থিত ছিলেন ঝেংঝো বিশ্ববিদ্যালয় ও হেনান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি শিক্ষার্থী বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীগন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন এস. এম আকাশ, ইনজামুল করিম ও মোঃ আপন ইসলাম। জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয় এবং পরবর্তীতে বিজয় দিবসের তাৎপর্য নিয়ে

আলোচনা করেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দগণ। আলোচনার সময় উঠে আসে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে নানান তথ্য কিভাবে ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক, কামার-কুমার, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শিশু-কিশোর, নারী সবাই অংশগ্রহণ করে এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করার আকাঙ্ক্ষায় তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে যায়। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের পর বাংলার মানুষের এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় ১৬ ডিসেম্বরে। তাই ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় কোনো সাধারণ বিজয় নয়, এটি আমাদের রক্তে রঞ্জিত চেতনার বিজয়, আমাদের জাতীয় আত্মপরিচয়ের বিজয়।সর্বশেষ কেক কেটে বিজয় দিবসে উদযাপন করেন ঝেংঝু

বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বাংলাদেশি শিক্ষার্থী। বিজয় দিবসের শপথ হোক, সব ধরনের হানাহানি ও বৈরিতা-বিদ্বেষকে পেছনে ফেলে, দেশের ও জনগণের কল্যাণে সবাই এক হয়ে কাজ করব।

মোঃ আপন ইসলাম
ঝেংঝু বিশ্ববিদ্যালয়
হেনান প্রদেশ, ঝেংঝু. চীন।

জন্ম নেয়াটাই বুঝি আজন্ম পাপ!

বয়সই বা কত! এই ধর ৫ কি ৬।

অন্য ছেলে-মেয়েদের মতো

খেলতে খেলতে আমারও স্কুলে যেতে খুব ইচ্ছে হয়।

খেলার বয়সে আজ সংসারের দায় পাহারসম,

সাধ্য নেই সে দায় অগ্রাহ্য করার।

ঘন বরষায় ঘোর কালো মেঘের বেশে মায়ের কোল ঘেঁষে জন্ম নিয়েছিলাম বলে মা ঈষৎ হেসে সেদিন নাম রেখেছিলেন বৃষ্টি। শহরের বৃষ্টি আর আমার মধ্যে আজ কোনো পার্থক্য নেই।শহরে বৃষ্টির পানির মতোই গড়িয়ে গড়িয়ে নর্দমার মুখে আমার জীবন পতিত হচ্ছে।গায়ে মাখবার কারো জো নেই।

আমি আগে কাগজ টুকাতাম। বন্ধুদের সাথে খেলতে খেলতে কাগজ টুকাতাম।একদিন রাস্তায় কাগজ টুকাচ্ছিএমন সময় মামা দেখে ফেললেন।ভেবেছিলাম হয়তো লঙ্কাকান্ড ঘটাবেন।কিন্তু কিছুই বললেন না, চুপচাপ এক পলক দেখে চলে গেলেন। বাড়িতে গিয়ে শুনলাম তিনি মায়ের কাছে নালিশ করছেন।বিনিময়ে মা আমাকে কয়েক দফায় বেদম পেটালো। কয়েকদিন পর মামা, মাকে ডেকে নিয়ে বললো, দেখ আমি তো বাগান থেকে ফুল তুলি, তা আমি যতটুকু পারি ফুল তুলে দিব।তোমার মেয়েকে সেগুলো বেচতে বলো।

সেদিন থেকে ফুল বেচা শুরু করি।কোনোদিন হয়তো ১০০ আবার কোনোদিন ২০০ টাকা আর মাঝে মাঝে ১৬ ডিসেম্বরের মতো দিনে ৩০০ টাকার মতো বেচতে পারি। যা পারি তা দিয়েই সংসার চালায়।

এইতো সেদিন একজন আংকেল তার ছোট মেয়েকে নিয়ে একটা ফুল নিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমি বললাম, আঙকেল ট্যাকা দিবেন না? সে বললো কিসের ট্যাকা! একটা ফুল নিসি দ্যাইখা ট্যাকা দেওন লাগবো! বললাম, আঙকেল আমরাও তো কষ্ট করি, আমরা কি করিনা? আপনার ১০ টাকা আমার এক বেলা খাওনের টাকা।পরে ১ টা থাপ্পর দিয়া সে চলে গেল।আমি স্তব্ধ হয়ে তাচ্ছিল্যের অভিবাদন সাদরে মেনে নিলাম আর চোখের কোণে জমে উঠা জলটা মুছে নিয়ে আবার ফুল বেচতে শুরু করলাম।

আবার একদিন সংসদ ভবনের সামনে ফুল নিয়ে বসে ছিলাম।সাজু ভাই আমাকে দেখেই বললো, একি বৃষ্টি তুই ফুল বেঁচিস কে! তোমার কি কিছু শিখতে ইচ্ছে করেনা? বললাম আমার নাচ, গানের খুব সখ।কিন্তু কেউ আমাকে শেখায় না।সেদিন সাজু ভাই আমাকে নাচ শিখিয়ে দিলেন।সেদিন থেকে আমি নাচও শিখতাম আবার ফুলও বেঁচতাম।

আবার একদিন ফুল বেচতে বসছি। একটা আঙকেল, তার বউ, মেয়ে অনেকজন এসে অনেকটা ফুল নিল। কিন্তু যাওয়ার পথে মাত্র ৫ টা ফুলের দাম দিয়ে গেল আর দিলোনা।

আমরা যেন আর মানুষই না! মানুষ হবো কি করে! আমরা তো মানুষের কাতারেই পড়ি না। যাই হোক, এবার আসি বাবার কথায়।বাবা কোনো কাজ করেনা।মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে শুধু নেশা করে শুয়ে থাকে।

বাবার কাছে টাকা না থাকলে বাবা এসে মাকে প্রচুর মারে। আম্মু কেঁদে কেঁদে বলে আমি মইরা যামু, আমার এ দুনিয়াতে আর থাকার দরকার নাই। আমি মাকে

সেদিন বললাম, তে আমারে কে দেখবো! আমি কারে নিয়া বাচমু!

এইতো সেদিন ফুল বেচতেছিলাম। হঠাৎ একটা রিকশার ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় পরে গেলাম।হাটুতে আর হাতে বেশ খানিকটা ছিলে গেসে।কেটে যাওয়া অংশে মামা খানিকটা মলম লাগিয়ে দিলেন। প্রচুর ব্যাথায় আমি কান্না করলাম।পরে মামা বললো, থাক তোমার আর ফুল বেচতে হইবোনা।

আবার একদিন জ্যামের ভেতর ফুল বেচতেছিলাম, একটা বেটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। পড়ে গিয়ে পা অনেকটা কেটে গেলো।টাকার লাইগা হসপিটাল এ যাইতে পারি নাই। পরে মামা ন্যাকরা ছিড়ে পা'টা বাইন্ধা দিলো।

আবার একদিন একটা আন্টি দুইটা ফুল নিলো। পরে ২০০ টাকা দিয়া গেসে। আমি ওই টাকা দিয়া চাল ডাল কিনলাম আর বাকি ১০০ টাকা দিয়া মায়ের জন্যে ওষুধ কিনলাম।

জীবন চলছে তার আপন গতিতে।তোমাদের মতো আমাকেও কেউ যত্ন করলে, থাকার মতো একটা ঘর থাকলে, তোমাদের মতো ভালো ভালো পোশাক পরিয়ে স্কুলে পড়ার সুযোগ দিলে আমিও আজ মা বাবার ঘরে গোলাপ হয়ে ফুটতে পারতাম। তোমাদের অবহেলায় আজ আমি পথের পাশে বেড়ে উঠা দূর্বাঘাস। হয়তো তোমরা নিজেরাও জানো না তোমাদের মতোই আমরাও একেকটা ফুল। তোমাদের মতো অতি যত্নে বাড়ির আঙিনায় বেড়ে উঠতে পারিনি বলে সবাই পা দিয়ে মাড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে চোখ বুজে শুধু ভাবি পথের পাশে জন্ম নেওয়াটাই বুঝি আজন্ম পাপ!

ঐশী লুশিয়া মানখিন
মেডিকেল শিক্ষার্থী,
চায়না থ্রি গর্জেস ইউনিভার্সিটি, ইচাং, চীন।

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের ভূমিকা (১)

৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের এই স্বাধীন দেশ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭১ সালে সার্বভৌম বিমুক্তির দিকে এগিয়ে এসেছিল। এই যুদ্ধে বাঙালি জনগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য বিভিন্নভাবে অবদান রাখে। প্রবাসী বাঙালিরও এই মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল, সবার একযোগে অংশগ্রহণই আমাদেরকে স্বাধীণদেশ উপহার দিয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হল ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান সংঘটিত একটি বিপ্লব ও সহস্র সংগ্রাম। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ও স্বাধিকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এবং বাঙালি গণহত্যার প্রেক্ষিতে এই জনযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের ফলে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। পশ্চিম পাকিস্তান-কেন্দ্রিক সামরিক জান্তা সরকার ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনা করে এবং নিয়মতান্ত্রিক গণহত্যা শুরু করে। এর মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী সাধারণ বাঙালি নাগরিক,ছাত্র,শিক্ষক,বুদ্ধিজীবী , ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং পুলিশ ও ইপিআর কর্মকর্তাদের হত্যা করা হয়। সামরিক জান্তা সরকার ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলকে অস্বীকার করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের ভূমিকা:

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অমূল্য অধ্যায়, যেখানে প্রবাসী বাঙালিরা অমূল্য ভূমিকা পালন করে। প্রবাসী বাঙালি হিসেবে, তারা বিশ্বভরের বিভিন্ন দেশে জীবন যাপন করতে থাকলেও, মুক্তিযুদ্ধে জন্য অবদান রেখেছিলেন, হোক তাদের অবদান সামরিক, অর্থনৈতিক, বা জনসম্পর্কে তারকা অংশের। তাদের বিচারে একাধিক উদাহরণ হতে পারে মুক্তিযুদ্ধে জুড়ে তাদের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতির স্বার্থে বিশেষ ভূমিকা।

মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে, এবং প্রবাসী বাঙালির যোগদান দেশের উন্নতি ও প্রস্তুতির দিকে একইভাবে গুরুত্ব দেখতে পারতেন।

প্রবাসীদের সংগঠন এবং দান:

প্রবাসী বাঙালিরা দেশব্যাপী সংগঠন গড়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তাদের বিভিন্ন দেশে সংগঠিত করা সংগঠনের কাজ এবং তাদের প্রদানকৃত দান প্রশংসনীয় বিষয়। তাদের এই একতাবদ্ধতা আর একসাথে লড়াই করার জন্য যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল তা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়া আমাদের সকল মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের উদ্দীপ্ত করেছিল এই বিজয় নিয়ে আসতে

প্রবাসী বাঙালি সেনানীরা: মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে প্রবাসী বাঙালি সেনানীরা তাদের দুর্দান্ত সাহস এবং উৎসাহের মাধ্যমে বিজয়ের দিকে অগ্রসর হয়।

প্রবাসীদের দেশে প্রতিষ্ঠিত কর্মসংস্থান: মুক্তিযুদ্ধের পরে প্রবাসী বাঙালিরা তাদের দেশে এসে নতুন কর্মসংস্থানে অবদান রাখে। তাদের অবদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং উন্নত হয়।

প্রবাসীদের কর্মসংস্থানে সহযোগিতা:

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি তাদের দেশের কর্মসংস্থানে সহযোগিতা প্রদান করে এবং প্রবাসী ও দেশবাসীদের মধ্যে একত্রে কাজ করে এমন একটি সৃষ্টি করে।

কত শত ভাইয়ের বোনের রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীনতা, স্বাধীন সর্বভৌম দেশ। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তাতে সবার অবদান অতুলনীয়। ১৯৭১ সাথে শহীদ হওয়া সকল ভাই বোনদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে যে দেশ আমরা গড়েছি তাদের আমরা কখনো ভুলবো না। মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, এই ঐতিহাসিক সময়ে সমৃদ্ধ গীতির আবেগ উক্সাইয়েছে, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি"।

সুলতানুল আরেফিন

বেইজিং, চীন।

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের ভূমিকা (২)

ভূমিকা : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা মুক্তিযুদ্ধ হলো ১৯৭১ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত বাংলার মানুষের একটি বিপ্লব ও সশস্ত্র সংগ্রাম। বাঙালির সাহসী ইতিহাসের এক অপার মাইলফলক ১৯৭১। এক মহিমান্বিত এবং স্মৃতিমাখা ইতিহাস রচিত হয়েছে ১৯৭১ সালে। স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের আজন্ম লালিত স্বপ্ন। পশ্চিম পাকিস্তানিদের অধীনে দাস হয়ে থাকতে চায়নি এ দেশের জনগণ। রক্ত, অশ্রু আর হাজারো আত্মত্যাগের বিনিময়ে একাত্তরে আমরা আদায় করেছি স্বাধীনতা। আর বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অভ্যুদয় হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। মুক্তিযুদ্ধ তাই বাঙালী জাতির জাতীয় জীবনে এক অহংকার, গৌরবের এক বীরত্বগাঁথা তারই সাথে আজন্ম অশ্রুগাথা এক উপন্যাস।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট : ১৯৪৭ সালে জাতি ভাগের ভিত্তিতে জন্ম নেয় ভারত ও পাকিস্তান নামের দুইটি পৃথক রাষ্ট্র। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ছিল দুটি অংশ পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান। স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক-বেসামরিক ও রাজনৈতিকসহ সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যে জর্জরিত করতে থাকে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানকে। পূজিবাদী ভাবধারায় এপার বাংলার শ্রমিকদের নাম মাত্র অল্প বেতন দিয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অপরদিকে উৎপাদনের কাজ চালানো হতো অন্যদিকে,রাজস্ব থেকে আয়, রপ্তানি আয় প্রভৃতির বিশাল অংশ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বসাকুল্য উন্নয়নে। সমীক্ষা অনুযায়ী বলা যায়,পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় যেখানে ৯৫% ব্যয় হতো, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় ব্যয় হতো মাত্র ৫ শতাংশ। পরবর্তীতে ১৯৭০ এর নির্বাচনে বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পশ্চিম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী তথা ইয়াহহিয়া খান কোনোভাবেই বাঙালির হাতে শাসনভার তুলে দিতে চায়নি পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অভাব, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, অবকাঠামোগত উন্নয়নে অবহেলা, মৌলিক নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপসহ সকল প্রকার বৈষম্য স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গঠনের দাবিকে জোরালো করে তোলে।

মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বগাথা : ২৫শে মার্চের ভয়ানক হত্যাযজ্ঞের পর সেটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ছাপানো হলে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন দেশের মানুষ ক্ষোভ এবন্দ দুঃখ প্রকাশ করে নিরীহ এবং নিরওপরাধ বাঙালিদের পাশে দাঁড়ায়।

সেক্ষেত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং আরো অনেক রাষ্ট্রীয়প্রধান এগিয়ে আসেন। বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিটলস এর জর্জ

হ্যারিসন এবং ভারতীয় পন্ডিত রবি শংকর 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এর আয়োজন করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীরা : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিরা সর্বতোভাবে পাশে ছিলেন। বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে দুটে গিয়েছেন। তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন। পাকিস্তানকে অস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ না করতে বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের নিকট আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রবাসীদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভুমিকা : ১৯৭১ সালের পহেলা মার্চ থেকে যে অসহযগ আন্দোলনের দাক দেয়া হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেনে বসবাসরত বাঙালিরা লন্ডনে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেন।বিভিন্ন স্লোগানে দলে দলে মানুষজন প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। এরপর ২৫ মার্চের কালোরাতের খবর প্রচারিত হওয়ার পর ২৬ মার্চ সকালে ইংল্যান্দে অবস্থিত পাকিস্তানের হাইকমিশ্নের সামনে অবস্থান গ্রহন করে বিক্ষোভ করেন।মুক্তিযুদ্ধে বিচারপতি আবু সাঈদ বিদেশের মাটিতে বিভিন্নভাবে গুরত্বপূর্ন ব্যাক্তিবর্গের সাথে দফায় দফায় আলোচন্আ করে আন্দোলন বেগবান করিয়েছেন। তাছাড়া ২৭ এপ্রিল প্রবাসী বাঙালিদের ভুমিকায় একটি দীর্ঘ আবেদন পাঠান হয় যুক্তরাস্ট্রের বিভিন্ন কংরেস সদস্যের প্রতি। তাছাড়া পাকিস্তানি হানাদার বাহীনীর কাল অধ্যায় বিদেশের মাটিতে ছড়িয়ে দিতে প্রবাসীরা বিদেশের মাটিতে বিভিন্ন পত্রিকা ছাপানোর ব্যবস্থা গ্রহন করেছিলেন যেটি সেই সময় বিশ্ব মানবতার কাছে পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বরতার খবর হাতে তুলে দিয়েছিল।

কানাডার অটোয়াতে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি এসসিয়েশন নামে একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে যেটির মূল লক্ষ্য ছিল মুক্তযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সাহায্য করা।তারই অংশ হিসেবে "ক্রাইসিস ইন বাংলাদেশ" শিরোনামে একটি সেমিনার আয়োজিত হয় প্রবাসীদের কল্যানে যেটি ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। তাছাড়া ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্টারী এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনে প্রবাসী বাঙ্গালীদের সফরকারী দল পাকিস্তানি হানাদার দের বর্বরতার কাহীনি বিশ্বনেতাদের সামনে তুলে ধরেন।সিংগাপুরে অবস্থান করা বাঙ্গালী প্রবাসীরা ২৭ মারচ্চ সকালে দলে দলে পাকিস্তান হাই কমিশনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। ১৯৭১ সালের ১১ই জুন প্রবাসী বাংলাদেশিরা আর্জেন্টিনার কাছে এক স্বমারকলিপি পাঠান যেখানে উঠে এসেছে সাহায্যের কথা এবং পূর্ণ বাস্তবত।

প্রবাসীদের ভূমিকায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকা সেসময় ব্যাপক ভাবে অবদান রেখেছিল।তার মধ্যে কয়েকটি হল, Bangladesh news bulletin, Bangladesh news letter (Chicago),Bangladesh Today ইত্যাদি, যুক্তরাজ্য প্রবাসি বাংলাদেশিরা কয়েকটী এম্বুলেন্স,মূল্যবান ঔষধপত্র হাসপাতালে চিকিৎসার

জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি,বিপুল পুরিমান কাপড়-চোপড় কিনে পাঠিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। যুক্তরাজ্য প্রবাসি বাংলাদেশিদের সাহায্য থাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য উন্নতমানের অস্ত্র ও খাদ্য ক্রয় করা হয় ফলে মুক্তিযুদ্ধারা সঞ্জিবনী শক্তি লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধ হয়ে ওঠে দুর্বার।

উপসংহার : ৩০ লক্ষ শহিদ আর লক্ষ্যাধিক মা বোনের ইজ্জতের মূল্য কারো জানা নেই। তবে ভারী নিঃশ্বাস ফেলে স্বাধীনতার পতাকা নিয়ে এগিয়ে চলেছে দুর্বার বাঙালি জাতি। ৭১ এ হার না মানা জাতির সেই অধ্যায়ে দেশে জীবন দেয়া মুক্তিযোদ্ধা থেকে শুরু করে বিদেশে প্রবাসে অবস্থানকারী প্রত্যেকে নিজ মাটির জন্য যে অবদান রেখেছে তা বাঙালি জাতি কখনোই ভুলবে না। তাইতো বিভিন্ন দিবসে বাঙালী জাতি এক হয়ে বিন্ম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করে জাতির শ্রেষ্ট সন্তানদের। তাদের জীবন দেয়ার কারণ হয়তো লুকিয়ে আছে কবির দুটি লাইনের মধ্যে,

“এমন দেশটি কোথাও খুজে পাবে নাকো তুমি

সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি” ।।

আবু সাঈদ
চায়না ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম,
বেইজিং, চীন।

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের ভূমিকা (৩)

পৃথিবীর অনেক দেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের ভূমিকা উল্লেখযোগা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর বিকল্প ঘটে নি। প্রবাসীদের মূলত বলা হতো সরবরাহ যোদ্ধা অর্থাৎ তারা সরাসরি মাঠে যুদ্ধ করেননি কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য বস্ত্র ও ওষুধ চিকিৎসা সরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি, সংবাদমাধ্যমে প্রচার মাধ্যমে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এজন্য জেনারেল এমএজি ওসমানী তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্বোধন করেন। আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে চলমান ফিলিস্তিন সহ বিভিন্ন দেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে ও বিষয়টি অনুধাবন করতে পারি মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের ভূমিকা কিরূপ হয।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাজ্যে ছিলেন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশি।

আমারিকা কানাডা ইন্দোনেশিয়া সহ অপরাপর কয়েকটি দেশত্ব কিছু সংখ্যক বাংলাদেশি বাস করতেন। সংখ্যা অল্প হলেও আমেরিকা প্রবাসি বাংলাদেশিরা 'বাংলাদেশ লিগ অফ আমেরিকা কানাডা প্রবাসি বাংলাদেশিরা 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ কানাডা ইন্দোনেশিয়া প্রবাসি বাংলাদেশিরা 'আমরা' ইত্যাদি সংস্থা গঠন করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করছেন। সে সময় ইংল্যান্ডে ছিলেন কয়েক লক্ষ বাংলাদেশি। বিলাত প্রবাসি বাংলাদেশিদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৯ জনই ছিলেন সিলেটী। মুক্তিযুদ্ধের সময লন্ডন প্রবাসি বাংলাদেশিদের ভূমিকা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওযার পূর্ব থেকে যুক্তরাজ্যে প্রবাসি বাংলাদেশিরা 'ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট' বাংলাদেশ সেন্টার' ইত্যাদি গঠন করে বাংলাদেশের পক্ষে আন্দোলন শুরু করে।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি আর্মি গণহত্যার সংবাদ পাশাপাশি স্বাধীনতা ঘোষণার খবর গার্ডিয়ান পত্রিকা ও রেডিও সংবাদের মধ্যেমে যুক্তরাজ্য প্রবাসি বাংলাদেশিরা ২৭ শে মার্চই শুনতে পান। আনন্দ বেদনার এই খবর শুনা মাত্র যুক্তরাজ্য প্রবাসি বাংলাদেশিরা ছুটে আসেন রাস্তায়। বিক্ষোভে ফোটে পড়েন। স্থানে স্থানে জনসভার ব্যবস্থা হয়। লন্ডনের 'স্মলহিত পার্কে'এক বিরাট গণসমাবেশ সরব জনাব জগলুল পাশা আমোক আলী আহসান ইস্মাইল, আফ্রোজ মিয়া, আব্দুল হান্নান সবুর চৌধুরী আব্দুল ওয়াহিদ লোদী প্রমুখ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষের ব্যাক্তিবর্গ বিভিন্ন দিক থেকে মিছিল সহকারে জনগণকে নিয়ে সমাবেত হন স্মলহিথ পার্কে। লন্ডনের বার্মিংহামের স্মলহিত পার্কে হাজার হাজার বাঙালির স্বতঃস্ফূত এ সমাবেশ অনুষ্টিত হয় ২৮ মার্চ ১৯৭১ রবিবার বভেলা ২ টার সময়। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৪র্থ খন্ড পৃ:১১)।

বেসরকারি হিসেবে প্রায় ১৫ লক্ষ পাউন্ড দান করেছেন যুক্তাজ্য প্রবাসি বাংলাদেশিরা । (৮ম জাতীয় ইতিহাস সম্মেলন ১৯৮৭ উপলক্ষে প্রকাশিত সিলেট দর্পণ-সম্পাদনায় মুহাম্মাদ আসদ্দর আলী; পৃষ্ঠা : ২৭)।

তানভীর ইয়াসির প্রীতম
বেইজিং, চীন।

ভাবনা

-নাইমুল ইসলাম

ওগো নির্ঝর প্রিয়সখী মোর প্রিয়তম হরিণী,

ফুটেছে দেখ আজ চক্ষু মেলিয়া অপরুপ কামিনী।

চন্দ্র বিলায় আলো করিতে উজ্জ্বল তব জ্যোৎস্না,

মোর হৃদয়ঙ্গম করিতে বিজয় আসছে কতই ভাবনা।

ও কুল পক্ষী বিছায়েছ কেন ধূম্র মায়াজাল -

তাই বুঝি মোর লাগেনা কিছুই ভালো,

এভাবেই বুঝি কাটবে বলো দিন দিন মহাকাল -

যে চোখ দেখেছে ঐ কাজল চক্ষু,

কি উপায়ে তাহা ভুলিবো আমি-

বড় আশা করে তোমারে যে বানায়েছি আমি মৃগাঙ্ক।

ও রমণী অঙ্গনা মোর ভিড়েছ আজ কোন জনা-

বিয়োগের ব্যাথায় হয়েছি যে আজ তরঙ্গহীন সিন্ধুকনা।

তুমি আসবে পদ্ম হয়ে সুপ্ত ইন্দ্রলয়ে,

আসবে তুমি কাজল টবে।

না না সব কল্পনা মোর রক্ত জবার টানে

জাগিয়া আছি স্মৃতিপাতা খুলে গাড় রজনীর প্রাণে।

ছায়া ছুঁই ছুঁই শুভ্র জ্যোৎস্না যেথায় হচ্ছে একাকার,

সেথায় বসেই ভাবছি আমি প্রেমিক রাহাবার

নাইমুল ইসলাম মেহেদি

নানজিং ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন সাইন্স এন্ড টেকনোলজি,

নানজিং, চীন।

না পাওয়া

-শেখ তাওহিদুল ইসলাম

ধরার মাঝে এ কি নিয়ম,
না পাওয়ার হার উঠছে চরম।
সাত সমুদ্র তেরো নদী,ওই পারে ও থাকে যদি,
না পাওয়ার এক ব্যাধি যেন ডাকছে সারাক্ষণ।
পত্র প্রাপক না পেয়ে আজ,
পত্রে যেন পড়েছে ভাঁজ।
সবাই যেন অশ্ববেগে ছুটছে যেন সুখের খুঁজে,
এক বেলাও খাবার ছাড়া দিন কেটে যায় কাজে।
অন্নছাড়া সুখ পাখিটি গাইছে না আর গান,
মিষ্টিমুখের গান যেন তার হয়েছে অম্লান।
একটুখানি সুখের ছায়ায় নিদ্রা যদি আসে,
ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠে দুঃখের ত্রাসে ভাসে।
হিংসা যেন ছাড়ছে না আর সঙ্গী তাহার হতে,
ভোরের পাখি ডাকছে না আর প্রভাত নিশিতে।
আম্রকানন ফাঁকাই যেন পড়ে আছে আজ,
কেউ যেন আর আম কুড়ায় না,কখন পড়ে বাজ।
সন্ধ্যা হলে পড়তে বসা উঠেই যেন গেছে।
ভোরবেলার ওই মক্তব যাওয়া পাই না তো আর খুঁজে।
ধরা মাঝে শুরু হল না পাওয়ার এক খেলা,
আসবেনা আর ফিরে যেন শুভ লগনের বেলা।।।

শেখ তাওহিদুল ইসলাম
ব্যাচেলর শিক্ষার্থী
সাউথ চায়না ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, গুয়াংজোও, চীন।

পতাকা

-মাইন উদ্দিন

পতাকা,
তোমায় রাখিতে শিরোর্ধ্বে, কতো প্রাণ হারাইলো সুর
নির্বাণ করিতে রোধ, কতো প্রাণ ধরিলো যুদ্ধের ধুর
পতাকা,
লাল সবুজে আঁকা বাংলার পতাকা।
তোমায় দিতে জয়, কতো প্রাণের হইল উদয়
বন্ধুক নলের সামনে দাঁড়িয়ে তারা কেবল একখানা কথায় কয়
জয় বাংলা বাংলার জয়।
পতাকা,
তোমার জন্য উদগ্রীব সকল তেজী প্রাণের জবানী
গেরিলার মুখে শুনি কেবল অমর সব সুরবাণী
পতাকা,
তোমার লাল বৃত্তে কত কালের নিকৃতি
সবুজ মাঝে আছে কেবল সোনার বাংলার আকৃতি
এভাবেই তোমার জন্ম
বীরের দেশে ভয় নেই, বীর প্রতি প্রজন্ম
সবি ঢেকে গেছে, বাংলার মুখে আজ সোনালী হাসি
পতাকা হাতে মোরা সব বাংলারে ভালোবাসি।

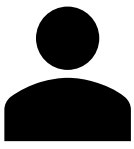

মাইন উদ্দিন

বেইজিং, চীন।

মায়াবী কাশফুল

– ঐশী লুশিয়া মানখিন

কিছু ফুল এমনিতেই খুব সুন্দর

ঠিক তোমার মতো।

সব ফুলই সুন্দর তবে ঠিক তোমার মতো নই।

ঋতুরাজ বসন্ত, সে তো সব ফুলের সমারোহে

নিজেকে সাজিয়ে লয়।

তুমি নাহয় শুধু শরতের 'কাশফুল' হয়েই থেকে যেও।

মাঝে মাঝে শরতের ওই নীলাভ আকাশে

সাদা মেঘ হয়ে ডেকে যেও।

আমি মলয় বাতাসে ছুটবো তোমার পিছু পিছু।

আমি যদি শীতের সকাল হই

তুমি ভোরের শিশির হয়ে

আমায় ছুঁয়ে যেও।

ঘন কূয়াশার চাদরে মিলায়ে যেতে দিও

হৃদয়ের ছোট্ট কোণে জমে উঠা

বিন্দু বিন্দু ভালোবাসা।

ঐশী লুশিয়া মানখিন
মেডিকেল শিক্ষার্থী
চায়না থ্রি গর্জেস ইউনিভার্সিটি, ইচাং, চীন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন

Md Fuhad Hasan

Asaduzzaman

Md Ayakub Nabi

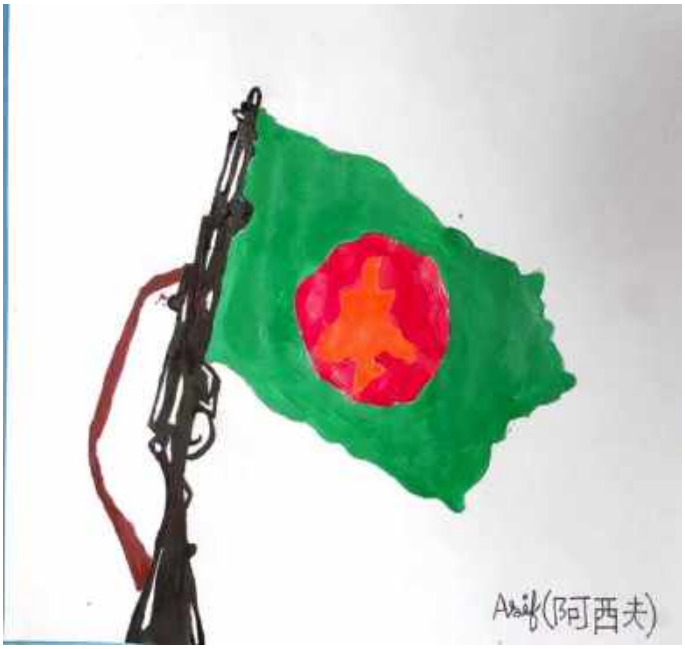

khandakar Asif

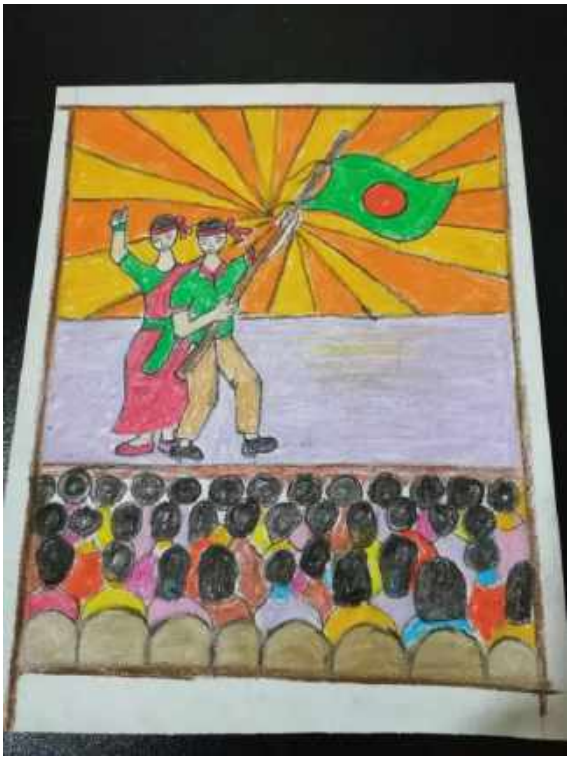

Mustavi Rafid

Sheikh Tania Mim

Nuhin Ibnat

Nazim Uddin

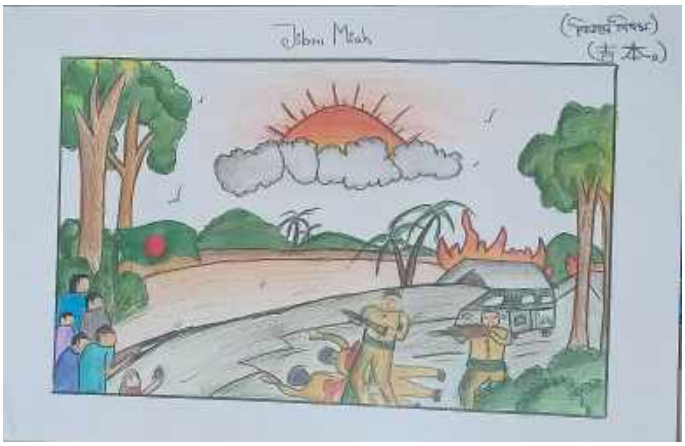

Jibon Mia

Al Islam Siam

মহাপ্রাচীর ম্যাগাজিন সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে
অথবা পরবর্তী সংখ্যায় লেখা পাঠাতে ইমেইল করুন :
mahaprachir@outlook.com

পূর্ববর্তী ম্যাগাজিনের সংখ্যাগুলো পেতে ভিজিট করুন :

https://www.bcysa.org/magazines

চীনে শিক্ষা, স্কলারশিপ, বাণিজ্য এবং চীন ও বাংলাদেশ সম্পর্কে আপডেট পেতে ভিজিট করুন :-

ফেইসবুক পেইজ :
www.facebook.com/bcysaofficial

ফেইসবুক গ্রুপ :
www.facebook.com/group/bcysa.cn

বিস্তারিত জানতে ভিজিত করুন :

www.bcysa.org